বিলেত দেশটা মাটির

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কথাকলি
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন • কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :

জন্মাষ্টমী

১৩৬১

প্রকাশক :

প্রকাশচন্দ্র সিংহ

১, পঞ্চানন ঘোষ লেন

কলিকাতা-৯

মুদ্রক :

কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :

শ্যামল সেন

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

মোহন প্রেস

মূল্য—চার টাকা

পিতামহ দেওয়ান রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

এই লেখকের

দূরের আকাশ
দ্বিতীয় পৃথিবী
ইওরোপের সূর্য
দেখা অদেখা
একদা যাহার বিজয় সেনানী

॥ এক ॥

ইংরিজি সিনেমায় ল্যাণ্ডলেডিদের চেহারা দেখেছিলাম—কুইন্সবরো টেরাসের মিসেস ক্লিমেন্টের দেখলাম সেই একই টিপিক্যাল চেহারা। মোটা শরীরের ওপর চাপানো লম্বা গাউন। বর্ষার চারাগাছের মত নাকের নীচে মৃত্থ গোঁফের আভাস।

তবে সিনেমার ল্যাণ্ডলেডিদের মত মিসেস ক্লিমেন্ট বদমেজাজী নন। মুখে সব সময় হাসি। কলিং-বেল টিপতেই দরজা খুলে দিয়ে এমন করে অভ্যর্থনা জানালেন যে, তিনি যেন এতক্ষণ আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

বাইরে দরজায় ভেকান্সি বোর্ড টাঙানো ছিল।

ফারুকি জিজ্ঞাসা করল : ইয়ে, মানে বাড়ি-ভাড়া আছে না-কি আপনার ?

ভেবেছিলাম সেই একই উত্তর শুনব। এর আগে আরও কয়েকটি বাড়িতে ভেকান্সি বোর্ড দেখে ঢুকেছিলাম। কিন্তু তুজন কৃষ্ণ-মূর্তিকে দেখে তাঁরা সকলেই মুখটা কাঁচুমাচু করে বলেছিলেন : সরি, এই কিছুক্ষণ আগে ভাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু মিসেস ক্লিমেন্ট অমায়িক হেসে বললেন : আছে মানে ! তোফা ঘর। একবার নিজের চোখেই দেখে যাও না বাছারা।

ঘর দেখে পছন্দ হয়ে গেল। বেসমেন্ট, অর্থাৎ, মাটির নীচে ঘর। তুটি খাট পাতা। স্প্রীংয়ের গদী। ড্রেসিং টেবিল, গ্যাসের উনুন, বড় আলমারি আর গরম ও ঠাণ্ডা জলের বেসিন। আর কি চাই।

ফারুকি বললে : তোফা। তা, কত ভাড়া ?

ভাড়া শুনে ভিরমি খাবার জোগাড়। হপ্তায় ছ'পাউণ্ড, মানে

আশী টাকার মত। দুজনকে ভাগাভাগি করে দিতে হবে। চাবির জন্যে জমা রাখতে হবে আরও তিন শিলিং।

ফারুকি গাঁই গুঁই করছিল। জনান্তিকে উর্দুতে বললাম: নিয়ে নাও হে, তিনঘণ্টা ধরে একটা ঘরের জন্য ওয়েস্ট এণ্ড চষে ফেললাম। এখন তো নিয়ে নেই। পরে সুবিধেমত উঠে যাওয়া যাবে।

কুইন্সবরো টেরাসের সেই মাটির নীচের ঘরে আমাদের অস্থায়ী সংসার পাতা হল। আমি আর ওমর ফারুকি। ফারুকির বাড়ি করাচীতে। একটি উর্দু দৈনিকের সম্পাদক। মাথায় গ্লোবের মত চকচকে টাক, ছোটখাট চেহারা। ফারুকির মস্ত বড় কোয়ালিফিকেশন সে এর আগে দুবার লণ্ডনে এসেছে।

বেশ ছিলাম ওয়েস্টওয়ে হোটেলে। দৈনিক সাতাশ শিলিং খরচ পড়ত বটে, কিন্তু কোন ঝামেলা ছিল না। কিন্তু ফারুকি বলল: আরে ইয়ার, খামাকা পয়সা নষ্ট করবে কেন? ছ'পাউণ্ডের মধ্যে এক সপ্তাহ হেসে খেলে কুলিয়ে যাবে। আর যদি নিজেরা রান্না-বান্না করি—তাহলে তো কথাই নেই। এই লণ্ডন শহরের ঘাঁত-ঘোঁত সব আমার নখদর্পণে। এখানে সব কাটথ্রোটের দল মুখিয়ে বসে আছে। তুমি ছেলেমানুষ, একটু সমঝে চলো। আমি বললাম, নিজেরা রাঁধব বল কি হে? তাহলে চুল বাঁধার সময় কোথায়? এবার ফারুকি একবার মোগল সম্রাটের মত হেসে নিল।

ঃ আরে বাবাঃ, এ তোমার কলকাতা শহর নয় যে রাঁধতে গিয়ে চোখের জলে নাকের জলে হবে, এ হল খোদ লণ্ডন। আর রান্নার ভার আমার ওপর। দেখ না কেমন তোফা ডিশ তোমায় খাওয়াব।

তা দেখলাম সত্যি সত্যি রান্নার ভার নিল ওমর ফারুকি। অবশ্য বিলেতে রান্নাটা মোটেই সমস্যা নয়। পাশেই দোকান। সেখানে চাল-ডাল থেকে শুরু করে কাঁচা লঙ্কা এবং কাসুন্দি পর্যন্ত পাওয়া যায়। দোকানের মালিক একজন আফ্রিকা-প্রবাসী

ভারতীয়। সাদা অ্যাপ্রন আর টাই পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তকতকে ঝকঝকে দোকান। সমস্ত জিনিস সুন্দর ভাবে প্যাক করা। মুদির দোকান বলতে আমাদের বৈঠকখানা বাজারের যে ছবিটি ভেসে ওঠে চোখের সামনে, সেটি মনে করতেই তখন যেন কেমন ভয় করে।

এই দোকানটিতে সব রকম মশলাপাতিই পাওয়া যায়। এমনকি কিছু তাজা আমও আমরা ঐ সময় দেখেছিলাম। বায়ুশূন্য কৌটায় করে আম ও লিচু বিলেতে প্রচুর চালান আসে এবং এ দুটি বস্তুই এখানে উপাদেয় খাদ্য।

এ ছাড়া অন্য কিছুর দরকার পড়লে আমরা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরগুলিতে যেতাম।

বিলেতের প্রত্যেকটি বড় বড় শহরে এই ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরগুলি এক একটি দর্শনীয় বস্তু। জুতো-জামা থেকে কেক, পরিজ, ফটো তোলার স্টুডিও থেকে তাজা আপেল—হেন বস্তু নেই যা এখানে নেই। টেবিলের ওপর স্তূপাকৃতি বস্তু খোলা সাজানো আছে। সেই সঙ্গে দাম লেখা। কোন লোকজন পাহারা নেই। আপনার যা প্রয়োজন তুলে নিন। তারপর চলে যান কাউণ্টারে। কিউতে দাঁড়ান। দাম দিয়ে রসিদ নিন। এক একটা স্টোর দোতলা, তিনতলা—প্যারিসে আমি একটি চারতলা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর দেখেছিলাম।

বিলেতে আমি যতদিন ছিলাম, ততদিন ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরগুলি ঘুরে ঘুরে বেড়ানো আর লোভে পড়ে কিছু কেনা-কাটা করা আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক স্টোরের ভেতর ক্যান্টিন আছে। সেখানে সস্তায় লাঞ্চ মেলে। এই সস্তা ধরনের ক্যান্টিনে আমি প্রায়ই লাঞ্চ খেতাম।

যাক, যে কথা বলছিলাম।

রান্না করার খুব ঝক্কি-ঝামেলা নেই। গ্যাসের উনুনে একটি

শিলিং ফেলে দিলেই দিন দুয়েক রাঁধবার মত গ্যাস পাওয়া যাবে। রান্না মাংস পাওয়া যায় কিনতে। শুধু একটু গরম করে নিতে যা সময়।

আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ি। ফারুকি রাঁধে। ল্যাণ্ডলেডি মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিয়ে যান।

— কি রাঁধছ বল তো? ভারি খারাপ গন্ধ বেরুচ্ছে। পাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা অবজেকশন করছিল।

ফারুকি কিমার সুরুয়া রাঁধছে। পেঁয়াজের গন্ধে ল্যাণ্ডলেডি ছুটে এসেছেন।

—ও একটা ডিলিসাস পাকিস্তানি ডিশ।

—কিন্তু পাকিস্তানি ডিশের জন্য আমি তো আর পাশের ঘরের আইরিশ ভাড়াটে হারাতে পারি না।

হাসিখুশী ধরনের ল্যাণ্ডলেডি, যিনি ক'দিন আগে ফারুকিকে কিং ফারুক বলে ডাকতেন, তাঁর এ ধরনের মূর্তি কল্পনা করতে পারিনি।

ভয়ে ভয়ে সুরুয়াটা নামিয়ে রাখল ফারুকি। আমি বললাম, আর তোমার সুরুয়া খেয়ে কাজ নেই বাপ। বিদেশ-বেঘোর। কে জানে, যস্মিন দেশে যদাচার।

ফারুকি আপসোস করতে লাগল: আরে ইয়ার, এই সুরুয়া রেঁধে আমার বিবিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম।

বললাম: কি করবে বল, সবই তোমার নসীব।

অবশেষে ফারুকি একটা ফন্দি বার করল! বলল: ইয়ার, চল বুড়িকে একদিন আচ্ছা করে দাউদ দিয়ে দি। পুরো পাকিস্তানি ডিশ। খুব সন্তুষ্ট হবে।

না-না করে ল্যাণ্ডলেডি নেমতন্ন-রক্ষায় রাজী হয়ে গেল। ফারুকি আর আমি সারাদিন ধরে বাজার করলাম। তারপর শুরু হল রান্না। রান্নার আগে দরজা-জানলা ভাল করে বন্ধ করে দিলাম। কি জানি,

পাশের ফ্ল্যাটের আইরিশ ভাড়াটে এবার ল্যাণ্ডলেডির কাছে নালিশ না পেশ করে হয়তো নিজেই এসে হাজির হবে।

ল্যাণ্ডলেডি আর তার স্বামীকে ডাকা হল। স্বামী ভদ্রলোককে এই প্রথম দেখা গেল। স্বল্পভাষী গোবেচারা টাইপের ভদ্রলোক। আয়োজনের পরিমাণ দেখে ল্যাণ্ডলেডির চক্ষু চড়কগাছ হবার জোগাড়।

—এ কী, তোমরা ইণ্ডিয়ানরা এই হাফ ডজন কোর্স খাও নাকি?

বিনয় করে বললাম: এ কী দেখছেন! আমরা যা খাই, তার সিকিও জোগাড় করতে পারিনি।

দেখলাম ল্যাণ্ডলেডির স্বামী খাবেন কি, ভোজ্যবস্তুর দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছেন।

ভদ্রলোক বললেন: এই যে শুনেছিলাম, তোমাদের দেশ খুব গরীব!

বললাম: আজ্ঞে, ঠিকই শুনেছিলেন, আমরা খেয়ে ও খাইয়েই গরীব।

কিন্তু ফারুকির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। পরের বারে যখন লণ্ডন গেলাম, তখন লণ্ডনে ট্যুরিস্ট সিজন। কোনখানে ঘর পাচ্ছি না। ফারুকি বলল: চল কুইন্সবরো টেরাসে। বুড়ি বোধহয় এতখানি অকৃতজ্ঞ হবে না। শুধু নেমন্তন্নই নয়, চলে আসার সময় বুড়ির হাতে কয়েক শিলিং গুঁজে দিয়েও এসেছিলাম।

বেল টিপতেই ল্যাণ্ডলেডি বেরিয়ে এল। : আরে, কিং ফারুক যে!

—চিনতে পেরেছ দেখছি। মিসেস ক্লিমেন্ট আমরা বড় বিপন্ন।

—ওমা, সেকি কথা! বল তোমাদের কি হয়েছে? মেট্রোপলিটন পুলিসে খবর দিতে হবে? সেখানে আমার এক হাফ-ব্রাদার কাজ করে।

—আমাদের একটা ঘর চাই।

—ওঃ, তাই বলো! সব ঘরই তো তোমাদের গোপাল। তোমাদের জন্যেই তো বসে আছি। বেশ তো, বেসমেণ্টের সেই ঘরে চলে যাও। এখনও খালি আছে।

—ছ' পাউণ্ড তো?

—হ্যাঁ ছ' পাউণ্ডই, তবে এবার আর দুজনে ভাগ করে দিলে চলবে না। জন প্রতি ছ' পাউণ্ড।

অর্থাৎ, বারো পাউণ্ড। একটি ঘরের ভাড়া মাসে সাতশো টাকা। ল্যাণ্ডলেডি বলল: তবু তো কম করে বললাম। এখন সিজন টাইম। ঘরের আমার আরও দর উঠবে বাছা।

একটু ঢোঁক গিলে ফারুকিকে উর্দুতে বললাম: চল, দেখি অন্য জায়গায়। অবস্থা খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।

এমন সময় ওপর থেকে তরতর করে নেমে এল কালো চুল, শ্যামবরণ এক তন্বী। কাজল-পরা চোখ দুটি তুলে 'এক্সকিউজ মি' বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

ফারুকি ফেল্ট ক্যাপটা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল: আর ইউ পাকিস্তানি?

—নো। ফ্রম সিলোন। তরুণীটি একটু হৃদয়বিদারক হাসি হাসল। ল্যাণ্ডলেডি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন: দেখ, দেখ, বহুৎ খুবসুরতী এই গার্ল তোমার পাশের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। মাত্তর ছ' পাউণ্ডের জন্য কেন দিক্ করছ বাছাধনেরা?

ফারুকির দিল বুঝি আস্তে আস্তে চুপসে কাদা হচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম: ইয়ে, মিসেস ক্লিমেণ্ট—আমাদের রেস্ত বড় কম। আমরা একটু বাইরেটা চক্কর মেরে দেখে আসি। কোন সস্তা আস্তানা পাই কি-না। ততক্ষণ আমাদের এই সুটকেসগুলো একটু রইল। এই কথা শোনামাত্রই ল্যাণ্ডলেডি হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

—আরে রামোচন্দর! তা কি হয়! এসব জিনিসপত্তর

আমাদের এখানে রাখবার আইন নেই। লণ্ডন শহর বড় ঝামেলাকি জায়গা।

অগত্যা সেই ভারি সুটকেসগুলো ঘাড়ে করে আমাদের পথে বার হতে হল।

দু চারটে জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে আমরা হাজির হলাম বেজওয়াটারে। ভারি সুটকেস বয়ে হাতটা টনটন করছে। ফারুকির অবস্থাও তথৈবচ।

বেজওয়াটার রোডের ওপর বিজ্ঞাপনের বোর্ড ঝোলানো থাকে। কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো নোটিস বোর্ডে ছোট ছোট কার্ডে মারা বিজ্ঞাপন। অধিকাংশই বাড়ি-ভাড়ার। ঠিকানা আর ফোন-নম্বর টুকে হাজির হলাম বেজওয়াটার টিউব স্টেশনে। এবার ফোন করে জানতে হবে বাড়ি খালি আছে কি-না।

কিন্তু বিধি বাম। টেলিফোন করলেই উত্তর আসে, সরি। কেউ মিষ্টি করে বলেন : এই কিছুদিন আগে ভাড়া হয়ে গেছে। বোঝেন তো স্যর, সিজন টাইম। কেউ বলে, যদি দিন চারেক পরে আসতে পারেন, তাহলে হয়তো হতে পারে, কারণ আমার এক ভাড়াটে উঠে যাচ্ছে কি-না।

ফারুকি বলল : নসীব যে এত খারাপ হবে কে জানত! চল, হোটেলেই ওঠা যাক। একটু বেশী পড়বে। কিন্তু তাহলেও বা করা যাবে কি!

ঠিক হল, আমরা এই এলাকার একটু সস্তা হোটেল দেখে উঠব। দৈনিক এক গিনির বেশী কিছুতেই ওঠা যাবে না।

হাজির হলাম এক হোটেলের সামনে। হোটেলের দরজায় আসতেই বেল-বয় এসে হাত থেকে খাতির করে সুটকেসটি নিল।

কাউণ্টারের সামনে বসে। এক মেমসাহেব কি লিখছিলেন। লিখতে লিখতেই বললেন : রিজার্ভেশন আছে?

কিন্তু ফারুকি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলঃ না, রিজার্ভেশন আর করব কি ম্যাডাম? দশ বচ্ছর বিলেতে আছি। যে সময় লণ্ডনে আসি, সেই সময়ই আপনার হোটেল। তা এর আগে কোন বার ওসবের দরকার হয়নি কি-না।

মেমসাহেব এবারও ঘাড় গুঁজে বসে বললেনঃ সরি, রিজার্ভেশন না থাকলে রুম হবে না। ভেরি স্যরি। ফারুকি বললঃ কিন্তু ম্যাডাম, আমরা আপনাদের দশ-বছরের পুরনো খদ্দের।

ম্যাডাম বললেনঃ ভেরি ভেরি সরি। একটাও সিট নেই। ফারুকি বললঃ কিন্তু যদি ধরুন আজ ম্যাকমিলান আর বাটলার সাহেব এসে রুম চাইতেন, তাহলে কি রুম দিতেন না?

মেমসাহেব এবার ট্যারাচোখে তাকিয়ে বললেনঃ তাহলে অবশ্যই একটা রুম দিতে হত।

ফারুকি এবার মরীয়া হয়ে বললঃ তাহলে বলছি ওঁরা কেউ আসবেন না। ওঁদের ঘরটা আমাদের দুজনকে দিন।

এই কথা বলে ফারুকি আর অপেক্ষা করল না। সটান আমাকে টেনে নিয়ে বড়রাস্তায় পড়ল।

অবশেষে ঘর পেলাম লেস্টার স্কোয়ারে। পাঁচতলার ওপর ডাবল বেড। সকালের নাস্তা মিলবে। সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড।

ল্যাণ্ডলেডি থাকেন নীচে। নীচে তাঁর অফিস। সেখানে খাতাপত্তরে একমাত্র রাশি-চক্র বাদে আর সব লিখে দিতে হল।

কিন্তু ফারুকির সঙ্গে একসাথে সহবাস ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠল। জান কয়লা হবার দাখিল। ফারুকি রাত দশটা পর্যন্ত বিবিকে চিঠি লেখে এবং সেই চিঠি আমাকে শুনতে হয়। সুর করে করে ফারুকি সেই চিঠি পড়তে শুরু করে। অবশ্য এখানে রান্নার পাটটা তুলে দিয়েছি। একদিন ফারুকি কিমা কা রসা করেছিল। সেই থেকে আমাদের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ হয়ে গেছে।

কিন্তু কিমা কা রসা না হয় সহ্য করা যায়। সবচেয়ে অসহ্য বস্তু যেটি, সেটি ফারুকির নাসিকা-গর্জন। সমুদ্র-গর্জনের মত তার সেই বিকট আওয়াজ দিনে দিনে যেন বেড়ে চলেছে। হয়তো সারাদিনের খাটুনির শেষে ঘুমটা জেঁকে এসে বসেছে, এমন সময় ফারুকির প্রবল নাসিকা-গর্জন শুরু হল।

ধড়মড় করে উঠে বসি।

—এই ফারুক সাব! ফারুক সাব! আরে, কেয়া কর রহা?

—কী ব্যাপার? কী হয়েছে? কোই দুশমণ?

—আরে, এইসা করকে নাক মাত্ ডাকাও।

—কেয়া ঝুটমুট বোলতা হ্যায়? কোথায় নাক ডাকাচ্ছি আমি?

—আরে, তোমার নাক ডাকানো কি তুমি শুনতে পাবে? লেকিন কই কমপ্লেন কভি নেহি? ফ্রম ইওর ওয়াইফ?

—না-না। কভি নেহি? কমপ্লেন হলে তালাক দিয়ে দেব না বিবিকে। আচ্ছা ভাই, ডোণ্ট মাইণ্ড। আউর হোগা নেহি। কিন্তু এই কথা বলে শোওয়ামাত্রই আবার নাসিকা-গর্জন শুরু হয় ফারুকির।

নাসিকা-গর্জন শুরু না হলেও ঘুমোবার আগে আরও উপসর্গ। সবে তন্দ্রা এসেছে।

—আরে চ্যাটার্জী, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? আজ এক বহুত তাজ্জব কি কাণ্ড-কারখানা হয়ে গেছে।

—কী হয়েছে?

বলব না বলব না করে, ফারুকি বলেই ফেলল কথাটা। সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। পাশে এক বেহস্তের হুরী বসেছিল। একথা সেকথায় আলাপ জমতেই ফারুকির দিল একেবারে বেপর্দা। হুরী বাইরে বেরিয়ে বললে: তুমি খুব মালদার আদমি, না? আমায় শাদি করবে?

ফারুকি কি জবাব দেবে ভাবছে। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে

বেহস্তের হুরী কোথায় হারিয়ে গেল, আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অবস্থা চরমে উঠল একদিন। বিলেতের ঘরগুলির দরজা 'সেল্ফ্ লক'। বাইরে থেকে ভারি দরজা টেনে দিলে আপনা-আপনি তালা বন্ধ হয়ে যায়। একদিন মাঝ-রাত্তিরে বাথরুমে গিয়েছি দরজা খুলে। পরনে শোবার পোশাক। ফিরে এসে দেখি দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর ঘুমোচ্ছে ফারুকি। দরজায় বারবার ঘা দিলাম। কোন শব্দ নেই। শুধু পাশ ফিরে শোবার শব্দ শুনলাম। বেশি জোরে চেঁচিয়েও ডাকতে পারি না। তাহলে পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন জেগে উঠবে।

এমতাবস্থায় খানিকক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরে সেই পাঁচতলা ভেঙে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে ল্যাণ্ডলেডির ঘরে পৌঁছলাম। বার কয়েক ঘা দিতে ল্যাণ্ডলেডি দরজা খুলে দিল। ভেবেছিলাম কপালে গাল-মন্দ আছে। কিন্তু না। ল্যাণ্ডলেডি ডুপ্লিকেট চাবিটি তুলে দিলেন আমার হাতে।

এর পরের বার লণ্ডনে যখন এলাম তখন আর ফারুকির সঙ্গে এক ঘরে থাকবার প্রস্তাব করিনি।

সেবার একলাই ঘুরছি পথে। কোথাও ঠাঁই নাই। তখন অগস্ট মাস। লণ্ডনে সারাদিন সূর্যের আলো। ফুটপাথে চেয়ার-টেবিল নামিয়ে বসে আছে কত লোক। বিজ্ঞাপন দেখে একটা বাড়ির সন্ধান পেলাম। ইনভারনেস টেরাসে। স্টেশন থেকে সবচেয়ে কাছে। ভাড়া সপ্তাহে মাত্র তিন গিনি।

ল্যাণ্ডলেডি ঘরটা দেখাল, দোতলায় একটি ছোট ঘর। একটু অপরিচ্ছন্ন। তবু তিন পাউণ্ডের মধ্যে তো হবে।

এক সপ্তাহের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে দখল করলাম ঘর। সারাদিন ছিলাম না। রাতে ফিরে এসেই চক্ষু চড়কগাছ। দুর্গন্ধ আসছে ঘর থেকে। কার্পেটটা কত যুগ ঝাড়া হয় নি কে জানে।

খাটের ওপর শুতেই মচ মচ করে উঠল। আর গায়ে দেবার লেপ বলতে যা আছে, একপ্রস্থ কম্বল। কিন্তু সবচেয়ে যে বস্তুটি এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, তা দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ হবার দাখিল। বাইরের দিকের দরজার স্কাইলাইটটা একদম ভাঙা। আর তার মধ্য দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা আসছে ঘরের মধ্যে। তাড়াতাড়ি ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে কোন রকমে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি ঠাণ্ডায় গলা বসে গেছে।

এখন কি করে ল্যাণ্ডলেডির কাছ থেকে অ্যাডভান্সটি ফেরত নিয়ে কেটে পড়া যায়। যদি বলি, তোমার ঘরের স্কাইলাইট নেই, তাহলে নির্ঘাত বলবে, কেন নেবার সময় দেখে নাওনি। আমতা আমতা করে বললাম ঃ দেখ, অফিস থেকে জরুরী টেলিগ্রাফ পেয়েছি আজ বিকেলেই আমাকে বার্মিংহাম চলে যেতে হবে। তা, এক রাতের জন্য এক পাউণ্ড ভাড়া কেটে নিয়ে যদি বাকিটা ফেরত দাও।

ল্যাণ্ডলেডি ভিজবার নয়। বললে—ওটি হবে নি বাছা। এখানে বিফলে মূল্য ফেরত দেওয়া হয় না।

বেজার মনে বিকেলে ফ্ল্যাটে ফিরে দেখি সামনেই ল্যাণ্ডলেডি।

—সে কী, তুমি চলে যাও নি এখনও ?

—কোথায় যাব ?

—সে তো তুমিই জান। বার্মিংহাম না কোথায়।

—ওঃ, সে তো পিছিয়ে গেছে। এই উইকের পরে।

—হুম্। তা, তোমার ঘরে কিন্তু কাল থেকে অন্য লোক আসছে।

—তার মানে ?

—খুবই সোজা। তুমি সকালে বলেছ, কাল সকালেই চলে যাবে। সেই অনুযায়ী ঘর অন্যলোককে ভাড়া দিয়েছি। কাল সকালেই অন্য পার্টি আসবে। তুমি আজ রাত্রের মধ্যেই কেটে পড়।

—তাহলে আমার বাকি ভাড়াটা ফেরত দাও।

—মাইরি আর কি !

নিরুপায় হয়ে গিয়ে পড়লাম প্রফুল্লবাবুর কাছে। আগে থেকে আলাপ ছিল। থাকেন পাশের বাড়িতে। লণ্ডনের অনেকদিনের বাসিন্দা। গিয়ে দেখি প্রফুল্লবাবু উঠে গেছেন পাশের রাস্তায়। মাসখানেক দেখাশোনা নেই। হঠাৎ উঠে গেলেন কি ব্যাপার?

প্রফুল্লবাবু বললেন—আর বলেন কেন দাদা! ল্যাণ্ডলেডি। কথায় কথায় জানা গেল দরজার চাবি ছিল না। খোলা রেখেই চলে যেতেন। একদিন ফিরে এসে দেখেন জিনিসপত্র ঘর থেকে সব উধাও।

ল্যাণ্ডলেডিকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল—হ্যাঁ, একজন তোমার খোঁজে এসেছিল বটে, তারপর আর কিছু জানি না।

কিন্তু প্রফুল্লবাবুও ছাড়ার পাত্তর নন।—ইয়ার্কি পেয়েছ? তুমি না জানলে, কোন লোক ঘরে আসতে পারে? এক্ষুণি পুলিসে খবর দেব আমি, আর বলব, আমি তোমার ভাড়াটে, অথচ রসিদ দাও না। ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছ।

এই কথাতেই কাজ হল। বাইশ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ আদায় করে বাড়ি ছাড়লেন প্রফুল্লবাবু।

কিন্তু এ হেন প্রফুল্লবাবুও আমাকে ভরসা দিতে পারলেন না। বললেন—তিন পাউণ্ডের মায়া ত্যাগ করে উঠে যান মশাই। কেন অযথা ঝামেলা পোহাবেন!

কারুর কাছে ভরসা না পেয়ে আমাকে অন্যায় ভাবে উঠে যেতে হল। আমি পাশের একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম।

কিন্তু ভাল ল্যাণ্ডলেডিও আমি দেখেছি। ভারতীয় ছাত্রদের নিজের সন্তানের মত স্নেহ করেন এমন অনেক ল্যাণ্ডলেডিও আছেন। তবে তাঁদের দেখেছি আমি লণ্ডনের বাইরে।

কারডিফের ১৭নং পেনিলান প্লেসের মিসেস কিমিনিস্কি ও উলভারহ্যাম্পটনের ১৩নং আভোনডল রোডের মিসেস উটন সম্পর্কে আমার এই সুন্দর স্মৃতিই জমা হয়ে আছে।
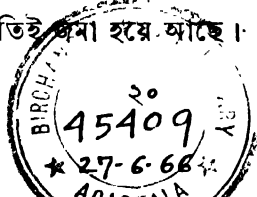
মিসেস কিমিনিস্কি জাতিতে ওয়েলস্। বিয়ে করেন এক পোলিশকে। স্বামী তাঁর কারডিফের বাস-কণ্ডাক্টর। কিন্তু তাঁর বাড়িতে একমাস থাকার পরও তাঁর স্বামীর কি পেশা আমি জানতে পারি নি। বিরাট দোতলা বাড়ি। আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া। টেলিভিশন, রেডিও, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন।

স্বামী আর দুই ছেলে নিয়ে মিসেস কিমিনিস্কির সংসার। ওপরে তিনজন গেস্ট। নীচে তাঁর পরিবার। মিসেস কিমিনিস্কিকে দেখতাম কি নিদারুণ পরিশ্রম করতে। সংসারের সমস্ত কাজ একা করছেন। ভোরবেলা উঠে ব্রেকফাস্ট তৈরি, ছেলেদের স্কুলে পাঠানো, লাঞ্চ তৈরি করা, স্বামীর সেবা-যত্ন, গেস্টদের পরিচর্যা,—কোন কিছুতেই তাঁর ক্লান্তি নেই।

মিসেস উটনও শ্রমিক-পরিবারের গৃহস্থ বধূ। তাঁর স্বামী কারখানার একজন শ্রমিক। কিন্তু সরল দিল-খোলা মানুষ। তাঁর বাড়িতে টেলিভিশন আর ওয়াশিং মেশিন দেখে আশ্চর্য হই নি, যতটা আশ্চর্য হয়েছি দেওয়ালে ল্যাণ্ডস্কেপ ঝোলানো দেখে। একজন অর্ধ-শিক্ষিত শ্রমিকের কাছ থেকে উচ্চ-বিদগ্ধ রুচি সত্যিই আমাকে বিস্মিত করেছিল।

মিসেস উটন কোনদিনই জানতে দেন নি যে, আমি তাঁদের পরিবারের একজন নই। এমনকি সামাজিক নিমন্ত্রণ-অনুষ্ঠানেও তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। গর্বভরে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, ইণ্ডিয়ান গেস্ট বলে।

অবশ্য সপ্তাহের প্রথমেই তাঁর প্রাপ্য চার পাউণ্ড মিটিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি যোগ্য ব্যবহারের কোন ত্রুটি করেন নি।

ঘুম ভাঙত মিসেস উটনের ডাকে। ওদের বাড়ি গরম জল পাওয়া যেত না। তাই ভোরবেলা উঠে দাড়ি কামাবার জন্যে গরম জল করতেন মহিলা। গরম জল হয়ে গেলে ঘুম থেকে জাগাতেন।

সন্ধ্যেবেলা খাওয়ার টেবিলে মিঃ উটনও বসতেন। স্যুপে চুমুক দিতে দিতে মিঃ উটন জিজ্ঞাসা করতেন : কী হে, আজ কেমন কাটল ? মিসেস উটন খুব সুরসিকা। জিজ্ঞাসা করতেন : কেমন, আজ কোন নাইস গার্ল-টার্লের সঙ্গে আলাপ হল না কি ?

মিঃ উটন বলতেন : কেমন লাগছে আমাদের এখানে ? আমি বললাম : একেবারে ঘরের মতন। পরের বাড়ি আছি বলে মালুমই হচ্ছে না। মিঃ উটন বলতেন : তাহলে তো তোমার নিজের বাড়ির পরিবেশ খুব ভাল হে !

আমি বলতাম : ঠিক বোধগম্য হল না কথাটা। মিঃ উটন বলতেন : সে বেশ মজা হয়েছে একবার।

একবার এক গেস্ট এসেছে থাকবে বলে। তাকে প্রথম দিনই অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম : তোমার নিজের বাড়ির মতনই মনে হবে আমার বাড়ি। কোন অসুবিধা হবে না।

এই কথা শুনেই লোকটা চলে গেল। যাবার সময় কি বলে গেল জানেন্ই—বলে গেল, বাড়ির অশান্তি থেকে হাড় জুড়োবার জন্যে ভাবলাম বাইরে কিছুদিন থাকি, তা এখানেও যদি বাড়ির মত হয়, তাহলে পত্রপাঠ বিদেয় হই।

মিঃ উটনের ভারত সম্পর্কে জ্ঞান কিংসলি মার্টিন কিংবা পেথিক লরেন্সের মত নয়। এজন্যে অবশ্য তাঁর খুব বেশী আপসোস নেই। মিঃ উটন নেহেরুর নাম জানেন। উচ্চারণ করেন—ন্যেরু। তাঁর ছেলে দুর্গাপুরের নাম শুনেছে। তবে সে দুর্গাপুরকে বলে ডুগাপু।

মিঃ উটন আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন আমি খ্রীষ্টান কি-না। তাঁর ধারণা ছিল, ভারতবর্ষের সব লোকই খ্রীষ্টান, আর পাকিস্তানের লোকেরা মুসলমান।

তবে ল্যাণ্ডলেডিরা সর্বক্ষেত্রেই যে এমন ভদ্রতার অবতার, একথা ঠিক নয়। উলভারহ্যাম্পটন শহরে খুঁজলে যে এমন দু'-একজনকে পাওয়া যেত না তা নয়।

একজন তো ল্যাণ্ডলেডির দুর্ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে খবরের কাগজের অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল! এক্সপ্রেস অ্যাণ্ড স্টার হল উলভ্যারহ্যাম্পটনের দৈনিক খবরের কাগজ। লোকটি একজন ভারতীয়। কাঁচুমাচু হয়ে সে আমাকে বলল: তার বন্ধু একজন আরব ব্যবসায়ী। খুব বিপদে পড়েছেন।

আরব ব্যবসায়ীটি কিছুদিন আগে এখানে আসেন ও দু সপ্তাহের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে এক বাড়িতে গেস্ট হন। দিন তিনেক কাটাবার পর ব্যবসায়-সূত্রে তাঁকে লণ্ডন চলে যেতে হয়। ভাড়া ফেরত চাইবার সময় ল্যাণ্ডলেডি বলেন, তা ফেরত হবে না, তবে তিনি যখন আবার ফিরবেন, তখন বাকী দিনগুলি তিনি ঐ বাড়িতে থাকতে পারবেন। ভদ্রলোক দিন দশেক পরে ফেরেন, কিন্তু ল্যাণ্ডলেডি বলে, ওটি চলবেনি বাছা। আবার তোমাকে নতুন করে ভাড়া দিতে হবে। পুরনো চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে।

কিন্তু ল্যাণ্ডলেডি সম্পর্কে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক যে ঘটনাটি, তা আমার বন্ধুর মুখে শোনা। বন্ধুটি ওয়েলসের সমুদ্র-সৈকত অ্যাবারস্মিথে একটি নিদাঘ-অবকাশ যাপন করেন জনৈক ল্যাণ্ডলেডির গেস্ট হিসাবে।

সেই থেকে ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে দহরম-মহরম। মাঝে মাঝে ল্যাণ্ডলেডি চিঠি লেখেন: হাউ সুইট ইয়ু ওয়্যার। আহা, কি সুন্দর তোমার ব্যাভার! বন্ধুটিও উত্তর দেন: কর্তামা, তোমাকেও আমার খুব ভাল লেগেছে, তোমাকে ভুলতে পারছি না।

ল্যাণ্ডলেডি লেখেন, আবার কবে আসছ? বন্ধুটি লেখেন, সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।

আবার গ্রীষ্মের ছুটি এল। ভদ্রমহিলার ক্রমাগত চিঠি। বন্ধুটি ভাবলেন, আর দেখতে হবে না, বুড়ি নিশ্চয়ই আমার প্রেমে পড়ে গেছে। কারণ, ক'দিন আগে সে কাগজে দেখেছিল, আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া ষোল বছরের একটি ছোকরাকে বিয়ে করেছে। বন্ধুটি

আমার তুখোড়, খাস পটলডাঙ্গার ছেলে। মনে মনে ফন্দি এঁটে বসল, প্রেমের অভিনয় করবে বুড়ির সঙ্গে। একমাস বিনিপয়সায় রাজসিক ভোজ। পত্রপাঠ অ্যাবারস্মিথের টিকিট কেটে হাজির হয়ে বললে : আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা।

বন্ধুটি রাজার হালে থাকে। বুড়ি জিজ্ঞাসা করে : আজ কি খাবে গোপাল ?

বন্ধু চোখ বুজে বলে : ফাউল-কারি, রেড ওয়াইন, আর সবশেষে পুডিং।

অবশেষে বিদায়ের দিন বন্ধুর আমার দারুণ স্ফূর্তি। জোর ম্যানেজ করা গেছে। একমাসের খরচ প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড বেঁচেছে। বন্ধু জুতো-জামা পরছেন এমন সময় ল্যাণ্ডলেডি এলেন। কোন কষ্ট হয়নি তো বাছা ? এই বলে এগিয়ে দিলেন একটি বিল। তাতে একমাসের ফুডিং, লজিং ও সার্ভিস বাবদ ত্রিশ পাউণ্ডের একটি হিসেব।

॥ দুই ॥

নামটা খুব জমকালো। মহারাজা রেস্টুরেণ্ট। দরজার সামনে পাগড়ি-বাঁধা এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান দাঁড়িয়ে। তার পরনে খাঁকি পোশাক। দেখতে ঠিক এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের বিজ্ঞাপনের সেই পাগড়ি-পরা লোকটির মত।

হোটেলটা আবিষ্কার করেছিল ফারুকিই প্রথমে।

সেদিন সকালে সবে লণ্ডনে এসে পৌঁছেছি। আগে থেকে শুনেছিলাম লণ্ডনে নাকি প্রতিটি পাড়ায় একটি করে ভারতীয় রেস্টুরেণ্ট আছে। সেখানে ভাত-ডাল-চচ্চড়ি সমস্ত কিছুই নাকি পাওয়া যায়। সবশেষে দই। একেবারে তোফা স্বদেশী খানা।

কুইন্সবরো টেরাসে আমাদের নতুন বাসায় বসে ভাবছিলাম—এই তল্লাটে একটা ভারতীয় রেস্টুরেণ্ট পেলে একেবারে মার মার কাট কাট হয়ে যায়। ভাবছিলাম, একবার কষ্ট করে খুঁজতে শুরু করলে কি একটা ভারতীয় রেস্টুরেণ্ট মিলবে না? কষ্ট করলে কি না মেলে!

এমন সময়ে ফারুকি ফিরল। তার হাতে কয়েকটা আপেল, পাঁউরুটি আর মাখন।

ঘরে ঢুকেই ফারুকি সেগুলি বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে বলল—আরে ভাই, কামাল হো গিয়া।

বুঝতে না পেরে বললাম—কেয়া হুয়া?

ফারুকি খাটের ওপর ধপাস করে বসে পড়ে বলল—মিল গিয়া।

তবুও বুঝতে পারলাম না। হেঁয়ালি করে কথা বলা ফারুকির চিরদিনের অভ্যাস। শেষকালে আস্তে আস্তে ভাঙল ফারুকি—খুব কাছেই, কুইন্সওয়ে টিউব স্টেশনের কাছে সে একটা ভারতীয় রেস্টুরেণ্ট আবিষ্কার করেছে।

—তাই নাকি! শুনেই দিলটা তিড়িং করে নেচে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল পোড়া ল্যাম্ব-চপ আর ফ্যানের মত স্যুপের বদলে ভাত-ডাল-সব্জী আর সবশেষে দই।

জিভের জল মুছে ফারুকিকে বললাম—তাহলে চল, এখুনি ডিনারটা খেয়ে আসা যাক।

ফারুকি বললে—সে কি, এই তো কিছুক্ষণ আগেই নাস্তা করলে!

একথা সত্যি, একটু আগেই আমি প্রচুর খেয়েছি। তবু বলা যায় না, রেস্টুরেন্টে হয়তো খাবার ফুরিয়ে যেতে পারে। শুভস্য শীঘ্রং।

আমরা ঢুকতেই দারোয়ান সেলাম করল। কপাল ঠুকে সেলাম সাহেব-দারোয়ানরা করে না। একমাত্র ভারতীয়রাই করে।

ভেতরে গিয়ে দেখলাম হিন্দী ফিল্মের গান হচ্ছে—'মেরে দিলনে পুকারে আজা।' মনে মনে খুব আনন্দিত হলাম। এই না হলে ভারতীয় পরিবেশ!

আমি ও ফারুকি ভারতীয় রেস্টুরেন্টে আসার জন্যে খাঁটি দেশী পোশাক পরে এসেছিলাম। ফারুকি পরল শেরোয়ানি, মাথায় ফেজ টুপি; আমি ট্রাউজার্সের ওপর প্রিন্সকোট চাপালাম।

কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখি ভারতীয় রেস্টুরেন্ট বটে, তবে ভারতীয় কই?

হ্যাঁ, ওয়েটাররা অবশ্য ভারতীয়। কুচকুচে কালো শরীর। সাদা পোশাকে তাদের কালো রঙে আরো বেশ চেকনাই খুলেছে। কিন্তু যারা খেতে বসেছে, তারা অধিকাংশই লালমুখো সাহেব।

ফারুকি বললে—এই সব হোটেলগুলো হল সিলেটি মুসলমানদের। ইংলণ্ডে যত ভারতীয় রেস্টুরেন্ট আছে তার সবই হল সিলেটিদের। মনে মনে উল্লসিত হচ্ছি। বাঙালী ঠাকুর, বাঙালীর হাতে পরিবেশন—তার ওপর ভাত-ডাল। 'লণ্ডন রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান!'

বসে আছি তো বসেই আছি। ওয়েটারের আর দেখা নেই।

না. দেখা পাচ্ছি। আর আমাদের টেবিল বাদ দিয়ে সাহেবদের টেবিলের প্রতি তাদের বেশি পক্ষপাতিত্ব বলে মনে হচ্ছে।

ফারুকি গজ গজ করে বললে—দেখছ, আমাদের মোটে মানছে না।

আমি বললাম—দেখছি রিমাইণ্ডার না দিলে চলবে না। একটু চেঁচিয়ে একজন ওয়েটারকে বাংলায় বললাম—এই যে দাছু, শুনছেন?

অমনি পাশের টেবিল থেকে জনকয়েক সাহেব-মেম কটমট করে আমার দিকে তাকাতে শুরু করল। ফারুকি তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল—এই বেয়াদব, বেতমিজ!

আমি খুব রেগে বললাম—খামকা গালি দিচ্ছ কেন?

ফারুকি বলল—আদব-কায়দা জান না? চেঁচিয়ে কখনও ওয়েটারকে ডাকতে নেই। হাতের ইশারায় ডাকতে হয়। অল্প করে তুড়ি মারতে হয়। তাও দেখ, তুড়ি মারারও নানা কায়দা আছে। তুড়ি একটু জোরে হয়ে গেলেই বেয়াদবী। বিলেতে আসার আগে একটা বই পড়া উচিত ছিল 'টেব্‌ল্ ম্যানার্স ইন টেন ইজি লেসন্‌স্'।

আমি মরমে মরে গেলাম। সত্যিই তো, বইটা না পড়ে ভুল হয়েছে। আমাদের টেবিলের পাশ দিয়ে ওয়েটাররা ট্রেতে করে গরম গরম পোলাও মাংস নিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা চুপ করে বসে আছি। ফারুকি তুড়ি মারতে শুরু করেছে। শেষকালে ওর আঙুল ব্যথা হয়ে গেল তবু কেউ এল না। ফারুকি বলল—এই টেবিলের ওয়েটার কি মরে গেল?

বললাম—হতে পারে। আবার নতুন লোক অ্যাপয়েণ্ট না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ফারুকি বলল—সেই গল্পটা জান না? এক ছিল হোটেলের ওয়েটার। সে মরার সময় স্ত্রীকে বলল—আমি তোমার জন্যে মৃত্যুর পরও অপেক্ষা করব। যদি তোমার কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হয় তাহলে জানিও। আমি আবার ফিরে আসব।

ওয়েটার মারা যাবার দিন সাতেক পরে হঠাৎ ওয়েটার-পত্নীর খেয়াল হল যে, সে মৃত স্বামীর সঙ্গে কথা বলবে। এবং শহরের এক ভূতের ওঝার কাছে গেল। ওঝা তাকে বলল, তুমি একটা টেবিলে এই কাঠিটা দিয়ে ঘা দাও, তাহলেই সে আসবে।

ওয়েটার-পত্নী তাই করল। কিন্তু কোথায় তার স্বামী? ভদ্রমহিলা এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলল—ওগো, তুমি আমার কাঠির আওয়াজ শুনছ, তবু কেন সাড়া দিচ্ছ না?

এই কথা বলামাত্তর স্বামীর আওয়াজ ভেসে এল। স্ত্রী শুনল, স্বামী বলছে—ওটা আমার টেবিল নয়।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। হাসি শেষ হতে না হতেই দেখি ওয়েটারের আবির্ভাব। আমি তাড়াতাড়ি খুশি হয়ে বাংলায় বললাম—বড্ড দেরি হয়ে গেল দাদু।

ওয়েটার আই. এ. এস-দের মত মুখ করে গম্ভীর গলায় বললে—হোয়াট উড ইয়্যু লাইক?

বললাম—ভাত ডাল মাংস আর তরকারি, সবশেষে দই।

—ফর টু?

বাংলা ছেড়ে ইয়াঙ্কি ঢঙে বললাম—ইআপ!

একটা থ্যাঙ্কু বলে ওয়েটার চলে গেল। আর ফিরল তার আধঘণ্টা পরে।

ফারুকি বলল—তোমাকেই কি অর্ডার দিয়েছিলাম?

ওয়েটার একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল—ইয়েস, দিস ইজ মাই টেব্‌ল্।

ফারুকি বলল—হয়তো তাই হবে। বহুকাল আগের ঘটনা তো তাই কিচ্ছু ইয়াদ করতে পারছি না। যখন অর্ডার দিই তখন তুমি কত ছোট ছিলে—এখন অনেক চেহারার পরিবর্তন হয়েছে।

ওয়েটার রামগরুড়ের ছানার মত মুখ করে ট্রে থেকে প্লেটগুলি নামিয়ে দিতে লাগল।

কিন্তু হায়, যখন বিল এল তখন মূর্ছা যাবার দাখিল। একপ্লেট

মাংস, একপেট ভাত, ডাল সব্জী আর দইয়ের জন্য বিল এল প্রায় পনেরো টাকার মত। ফারুকি গজ গজ করে বলল—কুছ মজা নেহি আয়া।

আমি বললাম—আমারই বা কি মজা লাগছে? মজা দেখছে হতচ্ছাড়া ওয়েটারগুলো। হিসেব করে দেখলাম যে, দুবেলা এভাবে খেতে গেলে মাসে এক-একজনের ন'শো টাকা করে শুধু খেতে লাগবে।

প্রফুল্লবাবু লণ্ডনের পুরনো বাসিন্দা। আমরা ভারতীয় রেস্টুরেণ্টে খেতে গেছি শুনে বললেন—আরে মশায়, করেছেন কি? বিলেতে এসেছেন, ক্যাজিনোতে (এক ধরনের জুয়ার আড্ডা) আর ভারতীয় রেস্টুরেণ্টে কখনও যাবেন না। সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরবেন।

আমি বললাম—মুই এই নাক-কান মুলছি।

প্রফুল্লবাবু বললেন—আমার এক বন্ধুর অভিজ্ঞতা শুনুন। নতুন এসেছে লণ্ডনে। খুব ভারত-প্রীতি। ভারতীয় খানা খেতে গিয়েছে বীরস্বামী রেস্টুরেণ্টে। (পিকাডালির ওপর বিরাট ভারতীয় রেস্টুরেণ্ট হল বীরস্বামী রেস্টুরেণ্ট। পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এখানে এখন ম্যানেজারি করেন।)

বন্ধু খুব দিলসে অর্ডার করেছেন। যখন বিল এল তখন বিলের অঙ্ক দেখে তিনি কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। চুপচাপ চোখ বুজে বসে রইলেন চেয়ারে। তাঁর বিল উঠেছে পাঁচ পাউণ্ড, প্রায় পঁইষট্টি টাকা। তিন কোর্স খানার চার্জ।

তাঁকে দেখে ওয়েটার মনে ভাবল, খদ্দের বুঝি অজ্ঞান হয়ে গেছে। সে তখন তাড়াতাড়ি একগ্লাস জল নিয়ে এসে চোখে-মুখে ঝাপ্টা মারতে লাগল। আমার বন্ধু তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত হয়ে উঠে পড়লেন। তিনি বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় ওয়েটার এসে তাড়াতাড়ি তাঁকে আর একখানি বিল দিল। বিলে লেখা আছে: এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল, ছয় শিলিং।

ভারতীয় রেস্টুরেণ্টে ভারতীয়র সংখ্যা কম কেন তা বুঝলাম।

ভারতীয় রেস্টুরেন্টগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে ইংরেজরা। যেমন কলকাতায় চীনা রেস্তোরাঁগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে ভারতীয়রাই। ভারতীয় রেস্টুরেন্টের আর একটি অসহ্য বস্তু হল তার রান্না। ডালের নামে যা দেয়, তা টেম্স্ নদীর জল, ভেজিটেবল অর্থে ঢেঁড়শ-চচ্চড়ি আর মাংস মানে তো অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যাণ্ড থেকে আনা সাত দিনের পুরনো মাংস।

তবু যে-সব ভারতীয় ভারতীয় রেস্টুরেণ্টে আসেন, তাঁরা আসেন মুখ বদলাতে, না হয় ইংরেজ বান্ধবীকে ভারতীয় খানার আস্বাদ দিতে।

উলভারহ্যাম্পটনে একবার আমার বন্ধু বিমান আর সীতানাথ তাদের দুজন ইংরেজ বান্ধবীকে ভারতীয় রেস্টুরেণ্টে নিয়ে গিয়েছিল। বিলেতে ভারতীয় তরুণদের একটা অলিখিত নিয়ম—কোন বান্ধবী জুটলে তাকে ভারতীয় খানা খাওয়াতে হবে।

একদিন সকালে দেখি বিমান আমার বাসায় এসে হাজির। কি না, আজ তারা ভারতীয় রেস্টুরেণ্টে যাচ্ছে। আমাকে যেতে হবে।

বান্ধবী দুজন তো ইণ্ডিয়ান ফুড বলতে অজ্ঞান।

প্রথমে এল 'ডাল স্যুপ'। মুসুরির ডালের জল। চামচে করে চুক চুক করে খেতে খেতে ওরা বলল—হাউ নাইস! তোমাদের ইণ্ডিয়াতে স্যুপের প্রিপারেশনই আলাদা।

বিমান একটু বিচলিত হয়ে হাসল।

ওদের বান্ধবীদের একজন কাঁটা-চামচে করে ঢেঁড়শ-কুমড়োর কুচি মুখে তুলে বলল—হোয়াট ইজ দিস?

সীতানাথ বলল—লেডিজ ফিঙ্গার। ভেরি পপুলার ইন ইণ্ডিয়া।

লিপস্টিক-মাখা ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে অতি সন্তর্পণে তারা সেগুলো মুখের ভেতর চালিয়ে দিল।

—ওহ্, হাউ নাইস!

সীতানাথ বলল—তোমরা প্রিপারেশন শিখতে চাও, আমি শিখিয়ে দিতে পারি। আই অ্যাম এ গুড কুক।

ওরা বলল—হাউ ইণ্টারেস্টিং!

কিন্তু বিল যখন এল, তখন বিমানের মুখে-চোখে জলের ঝাপ্টা দেবার অবস্থা। বিমান পকেট থেকে একটা পাঁচ পাউণ্ডের মত নোট বের করে দিল। ওয়েটার সেলাম করে বলল—টু শিলিংস মোর।

বিমান পড়ে যাচ্ছিল। সীতানাথ ওকে তাড়াতাড়ি ধরল। বললাম—থাক থাক, আমি দিচ্ছি। আমি এতক্ষণ কিছু খরচ করিনি।

তবু আমি ভারতীয় রেস্টুরেন্টের মায়া ছাড়তে পারিনি। আমি ইংলণ্ডের কোন শহরে গেলেই ভারতীয় রেস্টুরেন্টের খোঁজ করতাম। আমি যা স্কলারশিপ পেতাম তাতে টেনে-টুনে চলত। অথচ তার পরিমাণ কম ছিল না। আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করত—কী ব্যাপার, তোমার এই টাকায় চলছে না? লুকিয়ে বিয়ে-থা করেছ না-কি?

আমি বলতাম—না, ভারতীয় রেস্টুরেন্টে যাওয়া ধরেছি। এমন সঙ্কোচের সঙ্গে বলতাম যেন নাইট-ক্লাবে বা ক্যাজিনোতে কিংবা রেসের মাঠে যাওয়া ধরেছি।

লণ্ডনের কয়েকটি ভারতীয় রেস্টুরেন্টে ফিক্সড্ লাঞ্চ দিত। যতদূর মনে পড়ছে সাড়ে পাঁচ শিলিংয়ে তিন কোর্স লাঞ্চ পাওয়া যেত। বলা বাহুল্য, তাও অখাদ্য। সবশেষে থাকত সুইট। একটা শক্ত জিলাবি বা জিভে-গজা দিত। এত শক্ত যে কাঁটা-চামচে দিয়ে ভাঙা যেত না।

ভারতীয় রেস্টুরেন্টের কিছু কিছু কর্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গিয়েছিল। মহারাজা রেস্টুরেন্টের একজন ওয়েটারকে চিনতাম। সে বলত, সে স্টুডেন্ট। জিজ্ঞাসা করলে বলত—মেডিকেল লাইনে আছি। তার চেহারা দেখে তাকে স্টুডেন্ট বলে মনে হয়নি কোনদিন, অবশ্য চেহারা দেখে কাউকে বিচার করা যায় না। করা উচিত নয়। কিন্তু লণ্ডনে কত বিচিত্র বিষয় যে পড়াশুনার

আছে এবং তা পড়ে পাস করারও যে সব পাইকারি ব্যবস্থা, তা দেখলে ইচ্ছা হয় ফেরার সময় এক ঝুড়ি ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরি। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক তবলা বাজাবার নানা থিওরি সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছিলেন। তাঁকে বন্ধুরা আড়ালে বলত—তবলার ডাক্তার।

ভারতীয় রেস্টুরেন্টগুলোর নাম হয় সাধারণত কিসমৎ, কাশ্মিরী, আনারকলী ইত্যাদি। কারডিফে কিসমৎ রেস্টুরেন্টের একজন ওয়েটারের সঙ্গে আমার বেশ খাতির হয়ে গিয়েছিল। তার নাম রহমান।

রহমান বলত, তার দেশ করিমগঞ্জের কাছে। বছর দশেক হল বিলেতে এসেছে। হাজার পাঁচেক টাকা জমিয়েছে। দেশে আর ফেরার ইচ্ছে নেই। এখানেই বাড়ি-ঘর করে সংসার পাতবে। রহমান এদেশের লোকদের বাংলায় গালাগাল দিত।

বিলেতে অধিকাংশ লোককে লাঞ্চটা বাইরেই খেতে হয়। সকাল ন'টা থেকে অফিস। আমাদের মত নাকে-মুখে গুঁজে ওরা বেরিয়ে যায় না। দুপুর একটা থেকে দুটো লাঞ্চ। এই সময় ওরা লাঞ্চ সারে। অধিকাংশ বে-সরকারী অফিসে ক্যান্টিন আছে। সেখানে সস্তায় লাঞ্চ পাওয়া যায়। যাদের বাড়ি কাছে, তারা বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসে।

তবে বহু লোককে দেখেছি শুধু কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে লাঞ্চ করতে। সেই সঙ্গে এক পোয়া দুধ বা এক কাপ চা পেলে তো সোনায় সোহাগা। আমাদের অনেক সহকর্মী শুধু স্যাণ্ডইউচ খেয়ে লাঞ্চ সারতেন।

বাইরে লাঞ্চ খাওয়াটাই দস্তুর। এমনকি কোন ফ্যামিলিতে যারা পেইং-গেস্ট হয়ে থাকেন, তাঁদেরও দুপুরের খাবার বাইরে থেকে খেতে হয়। আমাদেরও তাই খেতে হত।

কিন্তু যে রেস্টুরেন্টে ওয়েটার আছে, সেই রেন্টুরেন্টে গোদের

ওপর বিষফোড়া আছে। অর্থাৎ টিপ্‌স্ আছে। একে তো খাবারের অত দাম। তার ওপর ওয়েটারকে রোজ দুবেলা টিপ্‌স্ দিতে গেলে অবস্থাটা খুব শোচনীয় হয়ে দাঁড়াত।

'বিলেতে উঠিতেও টিপ্‌স্, বসিতেও টিপ্‌স্'। প্রফুল্লবাবু একটা মজার গল্প বলেছিলেন—টিপ্‌স্ আদায় করার স্ট্র্যাটেজি হল ট্রেতে করে কিছু নিয়ে হাজির করা। আপনার চিঠি এসেছে, বেয়ারা সেটি ট্রের ওপর নিয়ে আপনার কাছে হাজির করল।

এক ভদ্রলোকের টেলিগ্রাম এসেছে। হোটেলের বেয়ারা দরজার বাইরে থেকে চেঁচাচ্ছে—স্যার, আপনার টেলিগ্রাম। ভদ্রলোক বললেন—নিয়ে এস ভেতরে। বেয়ারা জবাব দিল—তাই তো আসছিলাম স্যার, কিন্তু ট্রেটা কিছুতেই দরজা দিয়ে ঢুকছে না!

আমি আর ফারুকি ঠিক করলাম ওয়েটার ট্রেতে করে বিল নিয়ে আসার আগেই আমরা সুবোধ বালকের মত উঠে গিয়ে ক্যাশে টাকা জমা দেব। যেই বলা সেই কাজ। উঠে গিয়ে ক্যাশে টাকা দিলাম। কিন্তু দেখি চেঞ্জগুলো একটা ট্রেতে করে মুখের সামনে তুলে ধরেছে সেই ওয়েটার।

সেল্‌ফ্ সার্ভিস রেস্টুরেণ্টগুলি এই দিক থেকে খুব ভাল। কোন ঝামেলা নেই। প্যারিসে অবশ্য দেখেছি তাও লোকে টিপ্‌স্ দিয়ে যাচ্ছে।

বিলেতে রেস্টুরেণ্টগুলোর সামনে মেনু ঝোলানো থাকত। ফারুকি আর আমার হবি ছিল এই মেনুগুলি পড়া। এক জায়গায় দেখতাম হয়তো লেখা আছে, চিকেন: তিন শিলিং। আমরা হয়তো সেইদিনই কোথাও পাঁচ শিলিং দিয়ে চিকেন খেয়েছি। আমরা তখন মনে মনে আপসোস করতাম।

ফারুকি হয়তো এসে একদিন বলত—আজ টোটেনহাম কোর্ট রোডে একটা সস্তা রেস্টুরেণ্ট দেখে এলাম। ওখানে ল্যাম্ব-চপ আড়াই শিলিংয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

আমি হয়তো বললাম—আজ বণ্ড স্ট্রীটে একটা গলির মধ্যে আরও সস্তা রেস্টুরেণ্ট দেখে এসেছি, ওখানে এক শিলিংয়ে চিকেন-স্যুপ।

কোনদিনই আমাদের আর ওসব রেস্টুরেণ্টে যাওয়া হয়ে উঠত না। কিন্তু হল কি—সেদিন রাতে ফারুকি লাফাতে লাফাতে এসে হাজির।

—আরে ভাই, আজ কেয়া দেখা!

আমি বললাম—সমঝ গিয়া। সেই লেড়কিটার সঙ্গে দেখা হয়েছে তো, যে তোমায় শাদি করতে চেয়েছিল?

ফারুকি বললে—আরে বুদ্ধু, তার চেয়ে বড়িয়াঁ চিজ। মাত্র দু শিলিং ছ' পেন্স!

—কি ব্যাপার?

—আরে, দু শিলিং ছ' পেনিতে তিন কোর্স লাঞ্চ দিচ্ছে।

—কোথায়?

—স্ট্র্যাণ্ডে। এই রাস্তায় প্রায়ই যাই, অথচ আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি।

রবিবার দিন দুপুর বারোটার সময় আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। ভোরবেলা থেকেই তৈরি হয়ে নিয়েছি। আমাদের ওপরের ফ্ল্যাটে সাংবাদিক বন্ধু স্মিথ থাকত। সে ব্রিটিশ গায়না থেকে এসেছে। স্মিথ জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ?

বললাম—দু শিলিং ছ' পেনিতে তিন কোর্স লাঞ্চ।

স্মিথ বলল—আমিও যাব। স্মিথের এক বন্ধু ছিল, সে বললে, এই সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। আমিও যাব।

আমরা চারজন মিলে অভিযানে বের হলাম। কুইন্সওয়ে টিউব স্টেশন থেকে আমরা টিউবে চাপব ভাবলাম। কিন্তু স্মিথ বলল, বাসে করে যাওয়াই ভাল। অতএব পনেরো নম্বর বাসে চাপলাম। আমাদের নামবার কথা স্ট্র্যাণ্ডে, কিন্তু অল্ডউইচ পেরিয়ে যেতে খেয়াল হল যে, আমরা ঠিক জায়গায় নামতে ভুলে গেছি। কথা বলতে বলতে একদম খেয়াল ছিল না।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে উল্টো দিকের বাস ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু বাস আর আসে না। তার বদলে এল একটা খালি ট্যাক্সি। স্মিথ বলল—ট্যাক্সিতে ওঠা যাক, শেয়ারে ভাড়া দিলে গায়ে কিছু লাগবে না।

ফারুকি বলেছিল কাছে রেস্টুরেন্ট। কিন্তু দেখা গেল, ওখানে কোন রেস্টুরেন্ট নেই। আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিলুম।

আরও মিনিট পাঁচেক ঘোরার পর ফারুকির সেই রেস্টুরেন্ট বের হল। একটা গলির মধ্যে। ফারুকি বলল—কাল রাতে ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, এটাই বটে। দরজার সামনে লেখা ছু শিলিং ছ' পেনিতে লাঞ্চ সরবরাহ করা হয়।

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আমরা ভেতরে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে লাঞ্চ এল। স্যুপ বল যা দিল, তা একটু মুখে দিয়েই স্মিথ সরিয়ে রাখল। ল্যাম্ব-চপের নামে এক টুকরো বড় হাড় পেলাম। আর সুইটের নামে যে কঠিন বস্তুটি পাওয়া গেল, চেহারা দেখেই আমাদের খাওয়া মাথায় উঠে গেল।

হিসাব করে দেখলাম সস্তার তিন অবস্থা হয়েছে। চার শিলিং গাড়িভাড়াতেই খরচ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আরও সাড়ে পাঁচ শিলিং খরচ হবে—মহারাজা রেস্ট রেণ্টে এখুনি গিয়ে ঢুকতে হবে।

॥ তিন ॥

আমার ল্যাণ্ডলেডি মিসেস উটন বললেন—বাছা হে, নতুন মানুষ রাস্তাঘাট একটু দেখে-শুনে চলো। আর সব সময়ে কথার আগে বলবে 'প্লিজ', আর শেষে বলবে 'থ্যাঙ্কু'। আহা-হা, যাচ্ছ কোথায় ?

ভেবেছিলাম, হোম থেকেই চ্যারিটিটা শুরু করব। মিসেস উটনের নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার শেষে একটা 'থ্যাঙ্কু' বলে কেটে পড়ার তালে ছিলাম।

মিসেস উটন অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—একটু দাঁড়িয়ে যাও বাছা। এই বলে তিনি কি যেন আনতে ভেতরে চলে গেলেন।

ভাবলাম, হয়তো গীর্জার প্রসাদী ফুল, আর সাহেবী বিল্বপত্তর। বিলেতে এসেও স্নেহের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু মিসেস উটন যখন ফিরলেন, তখন তাঁর হাতে বিল্বপত্তরের বদলে একটা রুমাল। সেখানা আমার কোটের বুকপকেটে গুঁজে দিয়ে ত্রিশ ডিগ্রী কোণ করে তার কোণাটা বার করে রাখলেন।

—কী করছিলে বল তো! পার্টিতে যাচ্ছ, অথচ পকেটে রুমাল নিয়ে যাওনি। লোকে ভাবত এটিকেট জানে না।

মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম—থ্যাঙ্কু।

বিলেতে এসে ঐ একটা মোক্ষম অস্ত্রেই সকলকে বধ করতে শিখেছি। 'প্লিজ', 'এক্সকিউজ মি' আর সবশেষে 'থ্যাঙ্কু'। বাস-কণ্ডাক্টরকে ভাড়া দেবার আগে বলছি প্লিজ, ভাড়া দিয়ে বলছি থ্যাঙ্কু। স্টেশনের কুলিকে বলছি প্লিজ, ভিড়ের মধ্যে কারও পা মাড়িয়ে দিলে বলছি—এক্সকিউজ মি। আর সমস্ত জাতটার মুখে তো এই কথাগুলির খই ফুটছে।

পার্টিতে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল মিঃ এক্সের সঙ্গে। মিঃ এক্স করমর্দন করে বিড় বিড় করে কি বললেন। অনেকক্ষণ পরে বুঝলাম তিনি বলছেন, ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইয়্যু। আমাকে দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু এই আনন্দের কোন আগমার্ক তাঁর মুখে দেখলাম না। তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই দেখি তিনি মিঃ রবোটের মত পাশের আর একজনের সঙ্গে করমর্দন করে ঐ কথাই বলছেন—ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইয়্যু।

পার্টি মানে ত্ব ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে আলাপ করার ভান করা। আপনি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার সঙ্গে যেচে আলাপ করলেন মিঃ বি।

—আমার নাম মিঃ বি। আমি হলুম গে অমুক কোম্পানির (এক নামজাদা কোম্পানির নাম) অমুক (একটি বড় পোস্ট)।

আপনি—আপনাকে দেখে আনন্দিত হলাম মিঃ বি।

মিঃ বি—সিগারেট চলে ? (সিগারেট-কেস বার করে অফার)।

আপনি—থ্যাঙ্কু, থ্যাঙ্কু, আজ সুন্দর ওয়েদার, না ?

মিঃ বি—লাভলি, লাভলি (মহিলা হলে শব্দটিকে ভেঙে ভেঙে শেষ মাত্রাটির ওপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করবেন)।

আপনি—(যে-কোন একটি রসিকতা)।

মিঃ বি—(উচ্চহাস্য ও আর একটি সিগারেট অফার)।

এরপর নিম্নলিখিত সময় অনুযায়ী তুজনের মধ্যে আলোচনা। কঙ্গো প্রসঙ্গ—২ মিঃ। ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি—৫ মিঃ। মিঃ নেহরুর পর কে ?—৩ মিঃ।

আলোচনা জমে উঠেছে। আপনি ভাবছেন : অহো, ইংরাজরা কি সদাশয়! আলাপকারিণী যদি সুন্দরী তরুণী হন, আপনি ভাবছেন : সমাজ সংসার মিছে সব। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মিঃ বি অথবা সেই ভদ্রমহিলা আপনাকে বিস্মিত ও ব্যথিত করে দিয়ে বললেন—এক্সকিউজ মি। তারপর ভিড়ের মধ্য থেকে কোন এক স্থূলাঙ্গিনী

বৃদ্ধা অথবা কানে হিয়ারিং-এড গোঁজা কোন ব্যক্তিকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—লেট মি ইন্‌ট্রোডিউস মিঃ জেড। তারপরে ভিড়ের মধ্যে তিনি সেই যে মিলিয়ে যাবেন, আর এ জন্মে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না।

তবু মিসেস উটনের কাছে আমি নিয়মিত এটিকেটের লেস্‌ন্‌ নিচ্ছি।

মিসেস উটন বললেন—এটিকেট শব্দটি হচ্ছে ফরাসী শব্দ! এর মানে হচ্ছে লেবেল বা টিকিট।

বললাম—মানে জাতে ওঠবার টিকিট—মানে সোসাইটিতে।

মিসেস উটন তাঁর অঙ্কিত ভ্রূযুগল পলকে নাচিয়ে বললেন—যা বলি তাই মন দিয়ে শোন। সাংবাদিকদের এই বড় দোষ, তারা নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবে। রাজ-দরবারে যে সব লোকদের গতায়াত ছিল, তাদের কতকগুলি আদব-কায়দা রপ্ত করতে হত। আর ঐ সব কার্ড বা লেবেলে, এই আদব-কায়দাগুলি লেখা থাকত।

আমি ঈষৎ পরিহাস করে বললাম—আন্টি, হ্যাম্পটন কোর্টের আদব-কায়দা দয়া করে কেন উলভারহ্যাম্পটনে নিয়ে এলেন?

মিসেস উটন—তার কারণ, এখন এটিকেট কথাটির মানে পালটে গেছে। বাছা, এই দেখ ডিক্সনারিতে এখন এটিকেটের মানে হল—ফর্মালিটিস অফ ইয়্যুসেজেস রিকোয়ার্ড বাই দি কাস্টম্‌স্‌ অফ দি পোলাইট সোসাইটি। সভ্য সমাজের জন্য যে সব আদব-কায়দা ও আচারের প্রয়োজন তাকেই বলে এটিকেট। এটিকেট চার প্রকার—কার্টসি, কাস্টম্‌স, ম্যানার্স ও পোলাইটনেস। কী, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

একটু তন্দ্রা এসেছিল সত্যি। কিন্তু সেকথা অস্বীকার করে বলে উঠলুম—কে বলে আমি ঘুমোচ্ছি? আমি সব শুনছি আন্টি।

—তাহলে এই বইটা মন দিয়ে পড়। এটিকেট শিখতে পারবে।

মিসেস উটন একটা বই দিয়ে গেলেন: সরল এটিকেট শিক্ষা।

এটি পকেটবুক। আসল বইটি নাকি বিরাট আয়তনের। শুনে গায়ে কম্প দিল।

পাতা উলটোতেই প্রথম পরিচ্ছেদ। কেমন করে বেআদবীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে উপদেশ। প্রথম প্যারাগ্রাফেই লেখা—'সর্বদা সামান্যতম উপকারের প্রতিদানেও মুখটি হাসি হাসি করিবে ও থ্যাঙ্ক্ বলিবে। মাত্র দু-একবার থ্যাঙ্কু বলা অপেক্ষা ঘন ঘন থ্যাঙ্কু বলার অভ্যাস থাকা ভাল।'

আদব-কায়দার কড়াকড়িটা মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু প্রখর। যেমন, কোন মহিলা পথে-ঘাটে বা অর্ধ-পরিচিত ভদ্রলোকের দেখা পেলে তাঁকে যদি উপেক্ষা করেন ও তাঁর সঙ্গে একটু প্রমাণ সাইজের হেসে 'হ্যাল্লো, হাউ ইউ' ইত্যাদি না বলেন, তাহলে তা বিষম বে-আদবী। অবশ্য তিনি যদি হ্যাণ্ডসেক করার জন্য আগে-ভাগে হাত বাড়িয়ে না দেন, তাহলে কখনই কোন ভদ্রলোক নিজের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবেন না। যখন কোন অবিবাহিতা বা অল্পবয়সী মহিলার সঙ্গে বয়স্কা বা বিবাহিতা মহিলার দেখা হবে, তখন খাবারের অর্ডার দেবার দায়িত্ব বয়স্কা ও বিবাহিতা মহিলার ওপর বর্তাবে। যদি বাসে কিংবা ট্রেনে কোন পুরুষ কোন মহিলাকে উঠে দাঁড়িয়ে সিট অফার করেন, তাহলে সেই মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করলে বেআদবী বলে গণ্য হবে। যদি কোন মহিলা পথে-ঘাটে খুব বিপদে পড়েন এবং কোন পুরুষ যদি তাঁকে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তখন মহিলাটি করবেন কি, বীরপুরুষের নাম-ঠিকানা নিয়ে নেবেন ও পরে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দেবেন। কোন মহিলা যখন পুরুষের সঙ্গে বেড়াতে বেরোবেন, তখন তাঁর রেস্ত সম্পর্কে একটা অনুমান করে নেবেন। যদি বোঝেন ভদ্রলোকে ট্যাঁক খুব স্ফীত নয়, তাহলে তিনি তাঁকে সস্তা রেস্টুরেণ্টে নিয়ে যাবেন। কারণ সাহেবী কেতা অনুসারে রেস্টুরেণ্টের বিল-পরিশোধে পুরুষদেরই একমাত্র অধিকার।

নিয়মের রাজত্বে উঠতেও নিয়ম—বসতেও নিয়ম। সুতরাং খানা-পিনার টেবিলেও যে এটিকেটের টেব্‌ল্‌ ঝুলবে এতে আর বিচিত্তির কি!

টেবিলে ছুরি-কাঁটা আর চামচ কত ডিগ্রী কোণ করে থাকবে এবং অতিথিরা কে কোথায় বসবেন, তা অঙ্ক কষে বার করা রীতিমত ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম।

ইংরেজদের খাবার টেবিল, সার্জনের অপারেশন টেবিলের মত। সব ছকে বাঁধা। একচুল এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।

টেবিলের ডান দিকে থাকবে ছুরি, স্যুপ খাবার চামচ এবং কাঁটা চামচ থাকবে বাঁ দিকে। মিষ্টি খাবার চামচ আর রুটিতে মাখন লাগাবার ছুরি থাকবে আড়াআড়ি ভাবে সামনে। এক-একজনের প্লেট আর ছুরি-চামচ থাকবে বিশ ইঞ্চি জায়গা জুড়ে। এক টেবিলে যদি ছ'জন বসে, তাহলে তার মাপ হবে ৩০″ × ৫০″ ইঞ্চি। বাঁ দিকে আর-একটি প্লেটে থাকবে তোয়ালে, তার ওপর এক টুকরো রুটি, পাশে একটি ছুরি। ভারতীয়দের পংক্তি-ভোজনের মত বিলিতী ভোজসভাতে নিমন্ত্রিতরা যেখানে খুশি বসবেন, তা চলবে না।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সবচেয়ে যে মহিলা হোমরা-চোমরা, তিনি বসবেন নিমন্ত্রণকর্তার বাম পাশে। সবচেয়ে হোমরা-চোমরা ভদ্রলোক বসবেন নিমন্ত্রণকর্ত্রীর বামে। একজন মহিলার পাশে অবশ্যই একজন পুরুষ বসবেন এবং বলা বাহুল্য, কোন ভদ্রলোকের পাশেই তাঁর নিজের স্ত্রী বসবেন না।

খাবার বেলাতেও বিভিন্ন কানুন আছে। স্যুপ মুখে দিতে হবে চামচের পাশ দিয়ে, আগা দিয়ে নয়। কাঁটা-চামচ সব সময় ছুরির নীচে রাখতে হবে, আপেল কাটবার সময় প্রথমে চার টুকরো করতেই হবে, তারপর ছোট ছোট টুকরো করা চলবে। খাবার পরিবেষণ করবে ভৃত্যেরা, কিন্তু মদ? ভৃত্যেরা যদি ছোঁয়, তাহলেই মদ অশুদ্ধ। স্বয়ং গৃহকর্তা মদ পরিবেষণ করবেন।

খাবার টেবিলে কি ধূমপান করা যাবে ? নিশ্চয়ই যাবে। তবে তার জন্যে গৃহকর্ত্রীর অনুমতি চাই। আর পাশের জনের সঙ্গে কথা বলতেই হবে। প্রথমে শুরু করতে হবে ডান দিকের লোকের সঙ্গে, পরে বাঁদিকের লোকের সঙ্গে। পালা করে। কারও ওপর পক্ষপাতিত্ব দেখালে চলবে না।

একে তো সাহেবী খানা মানে সেদ্ধ আর গোলা। তারপর কেতা মানতে মানতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার দাখিল।

প্রথম কথা—মেনু লেখা ফরাসী ভাষায়।

মেনু দেখে ফারুকিও প্রথম প্রথম ভয় পেয়েছিল। ফারুকির দৃঢ় বিশ্বাস সমস্ত খাবারেই বরাহ-মাংস মিশ্রিত আছে। অথচ ফরাসী পড়তেও পারছে না। খোদার কসম, সে বিলেতে এসে জাত খোয়াতে পারবে না। একবার ডিনার-টেবিলে বেয়ারা বললে—হর্স ডি ওডার দেই ? ফারুকি জনান্তিকে বললে—আরে ইয়ার, কি অর্ডার দিতে কি অর্ডার দেব, শেষকালে হ্যামের বদলে ঘোড়ার মাংস এসে যাবে।

হর্স নামটা দেখে ফারুকি আতঙ্কিত হয়েছিল, এটি নির্ঘাৎ ঘোড়ার মাংস। কারণ সে শুনেছিল, বিলেতের লোকেরা নাকি ঘোড়ার মাংস খায়।

ফারুকি একটা টেব্‌ল্‌-ম্যানার্সের বই কিনে আগে থেকেই মুখস্থ করেছিল, তাতে লেখা আছে কোন্‌ খাবারটা শুধু ফর্ক দিয়ে খেতে হবে, আবার কোন খাবারটিতে শুধু ফর্ক ব্যবহার করা গুণাহ্‌। স্যুপ খেতে হবে চামচের পাশ দিয়ে চুক্‌ চুক্‌ করে। সামনে দিয়ে হুপ্‌ হুপ্‌ করে খেলে চলবে না। খাবার অল্প অল্প করে খেতে হবে।

কিন্তু আমাদের মুশকিল বাঁধত কথাবার্তা বলার সময়। ডানদিকের চেয়ারে বসে যিনি খাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে গল্প করা বিলিতি কেতা মতে আবশ্যকীয়।

বিলেতে লোকে লাঞ্চের সময়ই নাকি জরুরী কাজকর্ম সারে।

খাবার টেবিলে বসেই ব্যবসায়ীরা ব্যবসার কথাবার্তা সারেন। কণ্ট্রাক্টর মোটা রকমের কণ্ট্রাক্ট বাগান খাবার টেবিলেই। ক্লাবে বক্তৃতা হয় খাওয়ার শেষে, খাওয়ার টেবিলে বসেই সভ্যরা বক্তৃতা শোনেন। পাদ্রী ধর্ম-বিষয়ে উপদেশ দেন—তাও খাবার টেবিলে। কোন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে কারোর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, তাও খাবার টেবিলে। এক কথায় বিলেতে খাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র। আসল উদ্দেশ্য অন্য।

এক ঘণ্টা ধরে লাঞ্চ, কিন্তু তাতেও আমরা তাল রেখে চলতে পারতাম না। পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে এমন জমে গেছি যে, খাবার আর উঠছে না। হঠাৎ চমক ভাঙত যখন বেয়ারা আসত প্লেট তুলে নিয়ে যাবার জন্য। সকরুণ চোখে তার হাতে অর্ধভুক্ত প্লেটগুলি তুলে দিতে হত। কারণ দেখতাম পাশের সকলেই এ ব্যাপারে সব্যসাচী। তাঁদের হাতের ছুরি চলছে নিপুণ সার্জনের মত, আর মুখ চলছে হাইড পার্কের বক্তার মত।

কথাবার্তা সাধারণত হয় লঘু বিষয়ের ওপর। ইংরেজীতে এ সম্পর্কে একটা প্রবাদই আছে—অপটু কথাবার্তা ভাল খাবারকে নষ্ট করে দিতে পারে।

ইংরেজরা সাধারণত একটু স্বল্পভাষী, কিন্তু মার্কিনীরা বেশ কথাবার্তা বলেন। অথচ খাবার টেবিলে কথাবার্তা বলার নিয়ম! এক ইংরাজ ভদ্রলোক আর এক মার্কিনী ভদ্রলোককে নিয়ে একটা কৌতুকের গল্প আছে। খাবার টেবিলে মার্কিনী ভদ্রলোক পাশের ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে জমাবার চেষ্টা করলেন।

ঃ আপনি একজন পাবলিশার শুনলাম।

ঃ হ্যাঁ। উত্তর দিলেন ইংরেজ ভদ্রলোক।

ঃ আপনি নিশ্চয়ই বিচিত্র ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকেন ?

ঃ হ্যাঁ।

: আপনাকে অনেক বাজে পাণ্ডুলিপি পড়তে হয়, তাই ?

: হ্যাঁ।

: আপনার খুব বোরিং লাগে না ?

: হ্যাঁ।

: কিন্তু আপনি তো আর এই পেশা ত্যাগ করবেন না নিশ্চয়ই ? তাই না ?

: হ্যাঁ।

: বেশ, আমি আর আপনার সময় নষ্ট করব না। করব কি ?

: না।—ইংরেজ ভদ্রলোকের সংক্ষিপ্ত উত্তর ভেসে এল।

তবে এসব নিশ্চয়ই গালগল্প। কারণ আমি তো দেখতাম খাবার টেবিলে পাশের ইংরেজ ভদ্রলোকের গল্পের তোড়ে উড়ে যাচ্ছি।

ফর্মাল লাঞ্চ হলেই সবশেষে শুরু হত বক্তৃতা। একজন উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে দুটো চাপড় মারতেই গুণ-গুণ শব্দ থেমে যেত। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন : জেণ্টেলমেন—

তাঁর বক্তৃতা সব সময়েই খুব রসিকতাপূর্ণ হবার নিয়ম। প্রতিটি কথার শেষে দেখতাম সকলে হো হো হেসে উঠছেন। বুঝতাম না এর মাঝে কি যে রসের কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে হাসিতে যোগ দিতে হত। কারণ এক্ষেত্রে হাসাটাই দস্তুর। লাঞ্চ শেষ হলে ফারুকি গজর গজর করত—কুছ মজা নেহি আয়া।

আমি বললাম—তাহলে অত হাসছিলে কেন ?

ফারুকি বললে—না হাসলে ওরা মনে করবে ইণ্ডিয়া আর পাকিস্তানের লোকগুলো বেআদব, সেটা কি ঠিক হবে ?

একদিন ঠিক হল এবার যদি কোন পার্টিতে নেমতন্ন হয়, তাহলে আমাদের তরফ থেকে এটিকেট-মত বক্তৃতা দেবে মহম্মদ ওমর ফারুকি। কারণ এতদিন দলের আর সবাই বলেছে, শুধু ফারুকি বাকী। তখন আমরা কমনওয়েলথের আট দেশের আট জন সাংবাদিক

এক দলে আছি, আর ব্রিটিশ সরকারের অতিথি হিসাবে ব্রিটেন সফর করছি।

ফারুকির তো মহা ফূর্তি। সে কাগজে কি সব লিখে সারাদিন ধরে মুখস্থ করতে লাগল। এদিনে লাঞ্চ নয়, ডিনার। দিচ্ছেন স্বয়ং উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড পার্লামেণ্টের স্পীকার।

বেলফাস্টের পার্লামেণ্ট ভবনে ডিনারের আয়োজন হয়েছে। আমার পাশে এক ভদ্রলোক, তাঁর পাশে ফারুকি। লক্ষ্য করছি, ফারুকির খাবার দিকে তেমন নজর নেই। প্রায় কিছুই খাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরেই ফারুকি স্লিপে কি একটা লিখে আমাকে দিল। দেখি লেখা রয়েছেঃ দারুণ মাথা ধরেছে, বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হবে না।

এদিকে মহা মুশকিল। বিরাট টেবিলের চারদিকে ছড়িয়ে বসেছে দলের আর সবাই। এর মধ্যে কি করে এই দুঃসংবাদ জানাব।

এদিকে যথারীতি অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে। টোস্ট উৎসর্গ হয়ে গেছে। বক্তৃতা শুনে সবাই খুব জোরে হাসছে। বক্তৃতা শেষ হতেই আমাদের তরফ থেকে কিছু বলবার পালা। সবাই জানে ফারুকি বলবে। কিন্তু ও বেচারা ততক্ষণ মুখ নীচু করে বসে আছে।

হঠাৎ কী মনে ভেবে আমিই উঠলাম। তারপর দু তিন মিনিট ধরে কী যে বলে গেলাম, তা ভগবান জানেন। বক্তৃতা শেষ হতেই দেখি সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন। তাঁরা টেবিল চাপড়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। প্রথমে মনে ভেবেছিলাম বিদ্রূপ। কিন্তু বসে পড়তেই পাশের ভদ্রলোক বললেন—বেশ বলেছেন দাদা।

ব্রিটিশদের হিউমারবোধের চেয়ে তাদের সৌজন্যবোধের ওপর এবার থেকে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

ইংরাজদের সংবিধান অলিখিত, কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের

প্রতিটি ধারা সেদেশে লিখিত। একজন ভারতীয় ভারতে জন্মগ্রহণ করলেই ও পিতামাতা ভারতীয় হলেই খাঁটি ভারতীয় হতে পারে, একজন জার্মান দম্পতীর ছেলে জার্মান হবে, চীনা দম্পতীর ছেলে চৈনিক হবে এ আর বিচিত্র কি। কিন্তু খাঁটি ইংরেজকে তাঁর ইংরাজত্ব অর্জন করতে হয়। তা শুধু বার্থ সার্টিফিকেট পেলেই লাভ করা যায় না।

ইংরেজের সমাজ এটিকেটের নাগপাশ দিয়ে বাঁধা। পান থেকে চুন খসলেই এখানে বিপদ। তাই একজন ইংরাজ তার শিশুকে প্রথম যে কথাটি বলতে শেখায়, তা হল : থ্যাঙ্ক। দ্বিতীয় কথাটি হল : প্লিজ।

বাবা-মাদের কেমন কেতাদুরস্ত হতে হবে, এ সম্পর্কে একটা বইতে লেখা আছে স্বামী ও স্ত্রীর কেতাদুরস্ত ব্যবহারের ওপরই বিবাহের সাফল্য নির্ভর করছে। উদাহরণ স্বরূপ ঐ বইটিতে বলা হয়েছে, যে মহিলা ছোটবেলা থেকেই এটিকেট-সম্মতভাবে খাবার খেতে অভ্যস্ত, তিনি যদি কখনও দেখেন যে কোন পুরুষ আস্তিন-ওয়ালা শার্ট আর ব্রেস পরেই খেতে বসেছেন, তাহলে তাঁর পিত্তি জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। অথবা কোন পুরুষ, যিনি খুব কেতাদুরস্ত ও স্বল্পভাষী ব্যক্তিদের মাঝে মানুষ, তিনি যদি এমন মহিলার সান্নিধ্যলাভ করেন, যিনি চেঁচিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত, তাহলে তাঁর জীবন নিশ্চয়ই দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

ইংরাজদের কাছে সবচেয়ে আদরের জিনিস হল তার গৃহ। এ সম্পর্কে একটি কবিতাই আছে :

> "জার্মানরা থাকে জার্মানীতে
> রোমানরা থাকে তাদের রোমে,
> তুরস্কতে তুর্কীদের বাস
> ইংরাজরা রহেন শুধুই 'হোমে'।"

এই 'হোম' তাঁদের কাছে এক-একটি দুর্গ বিশেষ। এবং সে দুর্গ— সৌজন্যবোধের কাঁটাতার আর এটিকেটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

এটিকেট অনুসারে গৃহের প্রত্যেকটি লোকের 'প্রাইভেসি'র প্রতি প্রতিটি ব্যক্তির শ্রদ্ধা থাকবে। তার মধ্যে প্রধান হল ইন্‌ট্রুসন বা অনধিকার-প্রবেশের ওপর বিধি-নিষেধ পালন। এই ইন্‌ট্রুসন শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেই হতে পারে। এগুলি হল:

(ক) ষোল বছর বয়স হয়ে গেলে, কারুর ঘরে টোকা না দিয়ে কখনও ঢোকা উচিত হবে না।

(খ) কারুর ঘর বিনা অনুমতিতে অধিকার করা উচিত নয়।

(গ) কারুর ব্যক্তিগত চিঠি পড়বার বা পড়ে শোনাবার জন্ম পীড়াপীড়ি করা নিতান্ত বেআদবী।

(ঘ) কেউ যদি চুপ করে বসে থাকে, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যে, কী ভাবছ?

ইংরাজদের এটিকেট তাদের আর একটি জিনিস শিক্ষা দেয়, সেটি হল সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা অর্থে আমি পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলছি না, অপরকে সহ্য করার মত উদারতার কথা বলছি।

বিলেতের বাসে-টিউবে অফিস-টাইমে যা ভিড় হয়, তা কম নয়। বাসে অবশ্য বেশী যাত্রী বহন করা হয় না; কিন্তু টিউবে দারুণ ঠেশাঠেশি ভিড় হয়। কিন্তু একদিনের জন্যেও জায়গা নিয়ে কোন সহযাত্রীর সঙ্গে কারুর ঝগড়াঝাঁটি হতে দেখিনি।

ভিড়ের মধ্যে কারুর কনুইয়ে গুঁতো এসে পড়লে, বা কেউ কারুর পা মাড়িয়ে দিলে, কেউ তা নিয়ে অনুযোগ করে না। ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে আসে না।

একটা ঘটনার কথা মনে আছে। রাজকুমারী মার্গারেটের বিবাহের দিন বাকিংহাম প্যালেসের কাছে ম্যালে যে বিরাট জনসমাগম হয়েছিল, তা সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিরল। দেখলাম, এই দারুণ ভিড়ের মাঝে পুলিসের তাড়া খেয়ে বেড়া গলতে গিয়ে

এক যুবকের বুটশুদ্ধ পা সজোরে এসে পড়ল এক তরুণীর মুখে। ভাবলাম এবার একটা কুরুক্ষেত্র বাধবেই। অন্তত কিছু না হোক তরুণীটি নিশ্চয়ই রোষকষায়িত নেত্রে তরুণটিকে বলবেন: চোখটা কি পকেটে রেখে এসেছেন মশায়?

কিন্তু না, সে সব কিছুই হল না। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠে বললে– প্লিজ মশায়, অমন করে পদাঘাত করবেন না।

তরুণটি অপ্রস্তুত হয়ে বললে—সরি।

দেখি লাল গালে হাত বুলোতে বুলোতে তরুণীটি হাসিতে ফেটে পড়ছেন। যেন কি না জানি এক মজার ব্যাপার ঘটেছে।

চার চক্ষু ছানাবড়া করে ভাবলাম, বিলিতি এটিকেটের ধরনই আলাদা।

॥ চার ॥

কী কুক্ষণেই যে আমার নামে এক্সপ্রেস অ্যাণ্ড স্টারে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল! দিন দুয়েকের মধ্যে চিঠিতে চিঠিতে একেবারে ছয়লাপ।

আমার ক'জন বন্ধু বিলেতের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে লেখনী-বন্ধু পাতাতে চান জানিয়ে আমার কাছে চিঠি লিখেছিলেন। এক্সপ্রেস অ্যাণ্ড স্টারের চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ পেজের এডিটর মিসেস হিলকে বলতেই তিনি বললেন—ওমা, এই কথা, দাঁড়ান ব্যবস্থা করছি। অমনি পরের হপ্তায় তাঁর পাতায় বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল বড় বড় করে, যার বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ 'একজন ভারতীয় সাংবাদিক, এতদিন আমাদের সঙ্গে কাজ করে এবার দেশে ফিরছেন। এদেশের তরুণ-তরুণীদের তিনি ভারতীয় লেখনী-বন্ধু জোগাড় করে দেবেন। পত্রপাঠ যোগাযোগ করুন।'

বিজ্ঞাপন বেরুতে না বেরুতেই চিঠির বোঝায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার দাখিল। আট বছরের ছেলে থেকে আটচল্লিশ বছরের নিঃসঙ্গ বিধবা—সকলেরই আবেদনঃ আমায় একটা ভারতীয় লেখনী-বন্ধু জোগাড় করে দিন।

রোজ সকালের ডাকে আট-দশখানা করে চিঠি আসে। ফারুকি সেগুলো খোলে, আর চিঠির লেখক যদি মহিলা হয়, ফারুকি তার বয়সটা লক্ষ্য করে। কিন্তু ফারুকির নসীব বড়ই মন্দ। চিঠির লেখিকারা হয় আট বছরের খুকী, না হয় আটচল্লিশ বছরের বুড়ী।

এমন সময় ফারুকি একটা চিঠির ওপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়েই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলঃ মিল গিয়া।

কী ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই ফারুকি একটা চিঠি এগিয়ে দিল,

চিঠি লিখেছে জনৈক মিস লিলিয়ান টেলর স্ট্র্যাটফোর্ডশায়ারের ওয়ালশল থেকে। সে লিখেছে :

প্রিয় মিঃ চ্যাটার্জী,

আমি আপনাকে এই চিঠিটি লিখছি শুধু একথা জানবার জন্যে যে, আপনি আমাকে একজন লেখনী-বন্ধু জোগাড় করে দিতে পারবেন কি না। আমার বয়স আঠারো। আমার চুল কালো এবং কোঁকড়ানো, চোখের তারা ধূসর নীল। আমার হবি হল পপ রেকর্ড শোনা, নাচা এবং কুস্তি দেখা। আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জী, আমি আশা করি আপনি আমার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আমি সবেমাত্র হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি। দু হপ্তা আমি হাসপাতালে ছিলাম। ডাক্তার সন্দেহ করেছিল অ্যাপেনডিসাইটিস্ বলে। কিন্তু সে-সব কিছুই না, ওরা আমার একটা অপারেশন করে আর একটা দাঁত তুলে দেয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর আমি আমার 'ইয়ংম্যানে'র কাছ থেকে একটা চিঠি পাই, তাতে সে লিখেছে সে এখন আর-একটি মেয়েকে ভালবাসে। আমি যখন দু হপ্তা হাসপাতালে পড়েছিলাম, তখন তার কোন চিঠি পাইনি। সে আমাকে দেখতেও আসেনি এবং সে আমাকে কেন ত্যাগ করল তার কারণও জানায়নি। এই সময় আমি আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়লাম। আপনি আমায় দয়া করে একটা 'ইটালিয়ান ইয়ংম্যান' জোগাড় করে দিন। যদি ইটালিয়ান না পান তাহলে অন্য ইয়ংম্যানেও চলবে। আমার সব বন্ধুরাই তাদের ইয়ংম্যানের সঙ্গে বেড়াতে বার হয়, আমিই শুধু চুপ করে বসে থাকি, কারণ আমার কোন ইয়ংম্যান নাই। দয়া করে আমায় একটি জোগাড় করে দিন ও সাহায্য করুন। আমার হাতের লেখার জন্য ক্ষমা করুন, এখনও পর্যন্ত লিখতে গেলেই আমার হাত কাঁপে। আশা করি পত্রপাঠ উত্তর দেবেন।

আপনার বিশ্বস্ত—লিলিয়ান টেলর।

চিঠি পড়ে বললাম—হায় রে, শেষকালে ঘটকগিরিও শুরু করতে হল ! কিন্তু ইটালিয়ান ইয়ংম্যান কথাটা ধরতে পারছি নে তো।

ফারুকি বলল—ইণ্ডিয়ানকে সম্ভবত মেয়েটি ইটালিয়ান পড়েছে। ইয়ার, এর একটা আচ্ছা করে জবাব লিখে দাও তো, যাতে ছুকরির গরম দিল বিলকুল শরবৎ হয়ে যায়।

ঝামেলা বাড়াবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ফারুকির উৎসাহে চিঠির মুশাবিদা করতে হল, আর ফারুকি বললে, এর মধ্যে নাকি অ্যাডভেঞ্চারেরও গন্ধ আছে। চিঠির খসড়াটা দাঁড়াল ঠিক এই রকম—

প্রিয় লিলি,

অসংখ্য চিঠির মধ্যে তোমার চিঠিটি পাইয়া খুব ব্যথিত হইলাম। আনন্দিতও হইয়াছি, কারণ তুমি সরলা নারী, অকপটে আমার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছ। তোমার মধ্যে ঢাক-ঢাক নাই। তোমার চিঠি পাইয়া তোমার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হইতেছে। তোমার নিজ মুখ হইতেই তোমার জীবনের কথা শুনিব। আমার আবার একটু-আধটু সাহিত্য-চর্চার বাতিক আছে কি-না !

এক কাজ কর। আমাদের পার্টি এখন ট্যুরে বাহির হইতেছে। আগামী ১০ই নভেম্বর ৫টার সময় আমরা বার্মিংহামে পৌঁছিব। গ্র্যাণ্ড-হোটেলে উঠিব। তুমি দরজার সামনে আমার জন্য অপেক্ষা করিও। ইতি—

ফারুকি শুধু ছটফট করছে কবে আসবে ১০ই নভেম্বর।

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত তারিখ এল। বার্মিংহামে এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যার সময়। স্টেশনে নেমে ফারুকি বলল—আয়েগা কি আয়েগা নেহি ?

বললাম—নেহি।

ফারুকি বলল—আলবৎ, যদি আসে তাহলে কি হবে ?

বললাম – কী আবার হবে, রেস্টুরেণ্টের বিল দেবে তুমি।

হোটেলের দরজার কাছে দেখি দাঁড়িয়ে আছে রোগা, বেঁটে আর ফ্যাকাশে চেহারার একটি মেয়ে। মুখটা গণিতের পঞ্চম সংখ্যার মত। বয়স কমসে কম পঁচিশ-ছাব্বিশ। ফারুকিকে কানে কানে বললাম—এই বোধহয় সে মেয়েটি।

ফারুকি বললে—না না, এ হতেই পারে না, সে বহুৎ খুবসুরতী লেড়কি। আহা, সুইট এইট্টিন।

বললাম—কী করে জানলে?

ফারুকি একটু হেসে বলল—স্রেফ ইন্‌ট্যুইশন।

কিন্তু ফারুকির ইন্‌ট্যুইশনের পরখ পেতে আর দেরি হল না। সেই মেয়েটি হিল-তোলা জুতো পরে গট গট করে সামনে এসে বলল—আর ইউ মিঃ চ্যাটার্জী?

শুনে ভিরমি যাবার দাখিল। মেয়েটি কথা বলার জন্য হাঁ করতেই দেখা গেল পূর্ব-বর্ণনামত তার ওপরের পাটিটি দন্তশূন্য।

ফারুকি চোখদুটো কুমড়োর বড়ির মত করে বলল—আরে কেয়া, আগিয়া?

সামলে নিয়ে বললাম—তুমিই কি মিস টেলর—

মহিলা হেসে বলল—ইয়েস, ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইয়্যু মিঃ চ্যাটার্জী। আমি সেই দুপুর থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

ফারুকি কেটে পড়বার তালে ছিল। আমি তাড়াতাড়ি খপ করে ওর হাত দুটি ধরে ফেললাম। তারপরে বললামঃ আমার বন্ধু মিঃ ওমর ফারুকি ফ্রম করাচী। সেনসিবল অ্যাণ্ড স্মার্ট ইয়ংম্যান উইথ ইন্‌ট্যুইশন।

ফারুকি একবার করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে করমর্দনের জন্য হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল—হাউ ডু ইউ ডু?

রেস্টুরেণ্টে গিয়ে ফারুকি বলল—লিলিয়ান, কি রকম ইয়ংম্যান তোমার পছন্দ? মানে, কোন্ দেশের?

লিলিয়ান বলল—এখন আর দেশ নিয়ে বাছবিচার করব না। যে আমাকে ভালবাসবে, আমি তার।

কথায় কথায় জানা গেল লিলিয়ান শ্রমিক-পরিবারের মেয়ে। মিডল্যাণ্ডের শ্রমিকরা যে ধরনের ইংরাজী উচ্চারণ করে, লিলিয়ানের উচ্চারণ ঠিক তেমনি। সে বাসকে বলে বুশ, টাইমকে বলে টিম।

ফারুকি বলল—দেখ, তুমি খুব ভাল মেয়ে, তোমার মনে যে ব্যথা দিয়েছে, সে কত বড় দুশমন তা বুঝতে পারছি। কিছুদিন আগে হলে চ্যাটার্জীই তোমাকে বিয়ে করতে পারত। তবে কি-না, আমরা এই হপ্তায় দেশে ফিরে যাচ্ছি।

ফারুকির এই কথাটা শোনামাত্রই মনে হল এই গরম টোস্টের সঙ্গে ওকেও কামড়ে খেয়ে ফেলি। আমি কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় ফারুকির একটা প্রচণ্ড চিমটি এসে পড়ল আমার পায়ের ওপর। থতমত খেয়ে চুপ করে গেলাম।

লিলিয়ান কাঁদ কাঁদ মুখে বলল—তাহলে আমার কি গতি হবে?

ফারুকি বলল—তুমি একটা কাজ কর, লণ্ডনের কোন ফ্রেণ্ডশীপ ব্যুরোর মেম্বার হয়ে যাও। তোমার মত মেয়ে বাজারে পড়তে পাবে না।

লিলিয়ান বলল—মিঃ চ্যাটার্জি, আপনিও কি তাই বলেন?

আমি তাড়াতাড়ি একগ্লাস জল খেয়ে জবাব দিলাম—আমার বন্ধু মিঃ ফারুকি খুব অভিজ্ঞ লোক। আমি নিজে পর্যন্ত ওঁর বুদ্ধিতে চলি।

আরও কিছুক্ষণ পরে লিলিয়ানকে বার্মিংহামের ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে তবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। ফারুকির সঙ্গে দুদিন রাগের চোটে কথাই বলিনি।

লণ্ডনের ফ্রেণ্ডশীপ ব্যুরোতে লিলিয়ান চিঠি লিখেছে কি-না জানি না, তবে সে যদি চিঠি লিখত, তাহলে সেখানে নিশ্চয়ই মনোমত বন্ধু পেত।

বন্ধু অর্থে বঁধু। পুরুষ হলে তার গার্লফ্রেণ্ড, নারী হলে বয়ফ্রেণ্ড।

ইয়োরোপে বন্ধুত্ব সমানে সমানে হয় কি না জানি না, তবে একই গোষ্ঠীতে হয় না। ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় মেয়ের। মেয়ের সঙ্গে ছেলের।

আর সাধারণতঃ বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যই হল পরে বিবাহ। বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এ বিষয়ে ওদেশের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট স্বাবলম্বী। নিজেরাই মেহনত করে স্বামী বা স্ত্রী জোগাড় করে নেয়। এর জন্য চাই পরিচয়। পরিচয় গড়িয়ে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব ঘন হয়ে প্রেম, আর প্রেমের টার্মিনাস হল বিবাহ জংশন।

পরিচয় হয় অনেকের সঙ্গে অনেকের। বিলেতে বিয়ের বয়সী ছেলেমেয়ের মধ্যে পরিচয় হবার সুযোগ সীমিত নয়। বরং তার জন্য সমাজে ঢালাও ব্যবস্থা। যুদ্ধের পর মেয়েরা দলে দলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। দোকানে, রেস্টুরেণ্টে, অফিসে, বাসে, সর্বত্র ছেলেমেয়ে একসাথে কাজ করছে। অনেক স্কুলেও সহশিক্ষা। আমাদের দেশের মত তা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান মাত্র নয়—সহ-শিক্ষাই। এসব বাদ দিয়েও আছে মিক্সড্ ইয়্যুথ ক্লাব। ছেলে-মেয়েরা এসব ক্লাবের সভ্য এবং ক্লাবগুলি সরকারী সাহায্যপুষ্ট। আছে নাচের আসর। মিউনিসিপ্যালিটিগুলো থেকে এই সব নাচের ব্যবস্থা করা হয়। আর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার এমন বড় সুযোগ নাচের আসর ছাড়া আর কোথাও নেই।

প্রথম পরিচয়ের পর ছেলে-মেয়ের যদি পরস্পরকে ভাল লাগে, তাহলে তারা নিয়মিত প্রোগ্রাম করে। প্রেমের পরিভাষায় এর নাম 'ডেট'। শনি-রবিবার হলেই শহরের পার্কে, গ্রামের ঝোপে ঝাড়ে গাছতলায়, ঝরনার ধারে এই সব আপ-টু-ডেট প্রেমিক-প্রেমিকাদের জোড়ায় জোড়ায় দেখা যায়। কয়েকটা ডেট করার পরই তারা প্রমোশন পায় ফ্রেণ্ডের। তারা তখন গার্লফ্রেণ্ড আর বয়ফ্রেণ্ড। কানু ছাড়া যেমন গীত হয় না, পি. এ. ছাড়া যেমন ভি. আই. পি. হয় না, তেমনি গার্লফ্রেণ্ড ছাড়া পুরুষ হয় না, কিংবা বয়ফ্রেণ্ড ছাড়া মেয়ে।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রচার-দপ্তরের তরুণ অফিসার মিঃ শ্রুড একদিন কথায় কথায় বললেন—আমার এই মাফলারটি বুনে দিয়েছে আমার গার্লফ্রেণ্ড। আমাদের এক্সপ্রেস অ্যাণ্ড স্টার কাগজের কর্মচারী মিস জোন্স একদিন বলল—আমি সিগারেট খাই না বটে, তবে আমার বয়ফ্রেণ্ড স্মোকস টু মাচ। এত দুষ্টু ছেলে (হাউ নটি) ! কত করে বলি, ডোভড, বেশী বাড়াবাড়ি কোর না, কিন্তু কিছুতেই কি শোনে !

আর বিলেতে আমার সেই বাঙালী বন্ধু মিঃ দাস একদিন একটা রোগামত ফ্যাকাসে মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—মাই গার্লফ্রেণ্ড।

দাসের গার্লফ্রেণ্ড ওর আঁকা ভ্রূ কপালে তুলে বলল—হাউ ডু ইয়্যু ডু।

দাস বলল—ডার্লিং জান, মিঃ চ্যাটার্জি একজন জর্নালিস্ট।

ডার্লিং ভ্রূ ছুটো আর এক ইঞ্চি কপালে তুলে একটা কৃত্রিম স্বর বার করে বললেন : অ-অ—হাউ নাইস !

দাস ছিল এক মজার ক্যারেক্টার। কার্ডিফে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকত। কেউ বলত : দাস শ্বশুরের পয়সায় বিলেতে এসেছে, বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট পড়েছে। কেউ বলত : দাসকে দু'বছর আগে একবার ইউনির্ভাসিটির দিকে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে সে ও রাস্তা মাড়ায় না। ও এখন ডকের কোন অফিসে কেরানীর কাজ করে।

তবে দাস বলত—আমি রবার টেকনোলজি পড়ছি। একটা পাস দেওয়া হয়ে গেছে। ভাল চাকরি পাচ্ছি না বলে কলকাতায় ফিরছি না।

তবে দাসকে কারর্ডিফের বাঙালী ছাত্ররা কেউ পছন্দ করত না। আমাকে একদিন একজন বলল—আরে মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি ওই দাসটার সঙ্গে মিশছেন ! ওর কোন রুচিবোধ আছে ! ওর গার্লটাকে

দেখুন না। ওই রকম একটা টেডি গার্লকে গার্লফ্রেণ্ড করে সে ভারতীয়দের নাম ডুবোচ্ছে কিনা বলুন!

দাস আবার ওদের নামে বলে।—কে? ওই চন্দটা তো! আরে ছোঃ ছোঃ, ওর গার্লফ্রেণ্ডটাকে দেখেছেন তো, বয়সের গাছ-পাথর নেই। এর আগে আমার সামনেই চার জনের সঙ্গে প্রেম করে এখন চন্দর কাঁধে ভর করেছে। এই যে পণ্ডিত নেহেরু বিলেতের ভারতীয়দের নিন্দে করেন, তা কি সাধে!

দাস আমাকে মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যেত। সঙ্গে তার গার্ল থাকত। যদি কোথাও বাইরে যাবার প্রস্তাব করতাম, অমনি দাস বলত—দাঁড়াও, আমার গার্লটাকে নিয়ে আসি। কথাটা এমন ভাবে বলত যেন ছড়িটা নিয়ে আসি, বা চাদরটা নিয়ে আসি বলছে।

তবে যে বেচারার বঁধু নেই তার কাছে জীবন মধুময় নয়, বিষময়। লিলিয়ানের মত আর একজন মেয়ের কথা বলি, অবধান করুন। এই মেয়েটি চিঠি লিখেছে বিখ্যাত উম্যান পত্রিকায়। এই পত্রিকায় এডিলিন হোম নামে একজন মহিলা ছেলেমেয়েদের নানা ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন।

একটি মেয়ে লিখছে: আমার বয়স এখন সাতাশ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার বাবা-মাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। এবং আমার পক্ষে স্থায়ী বন্ধু জোগাড় করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। আমার মা-র একটা উলের দোকান আছে। আমি মা-র সঙ্গে দোকানে বসি। এবং অধিকাংশ দিন সন্ধ্যার সময় আটক থাকি। মাঝে মাঝে আমি আমার ছোট বোনকে নিয়ে বেড়াতে বার হই। কিন্তু সে বড় ছোট। আমি কিছুতেই বন্ধু জোগাড় করে উঠতে পাচ্ছি না।

এর উত্তরে ঐ মেয়েটিকে লেখা হয়েছে: খুব স্বভাবতই তোমার উলের দোকানে ইয়ংম্যানের ভিড় কম। কারণ, পুরুষরা খুব কমই

উল কিনতে আসে। সুতরাং তোমার মাকে বল, তোমার বদলে অন্য লোক রাখতে। তুমি কাজ নাও বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে। সেখানে বহু ছেলের সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে।

আর একটি মেয়ে লিখেছে: আমার বন্ধুরা তাদের বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে বেড়াতে যায়। আমারও ইচ্ছা করে ওদের সঙ্গে মিশতে। কিন্তু ওরা কেউ আমায় চায় না। আমার বন্ধুদের যখন সব ছেলেই চায়, আমাকে কেউ চায় না কেন?

উত্তরে লেখা হয়েছে: তোমার বন্ধুরা সম্ভবত ছেলেদের সঙ্গে খুব সহজে কথাবার্তা বলতে পারে। কারণ তারা সব সময় নিজেদের কথা বড় করে চিন্তা করে না।

এঁদের মত বন্ধু বা সঙ্গী যাঁরা জোগাড় করতে পারেন না, তাঁদের জন্য আছে ফ্রেণ্ডশীপ ব্যুরো। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত উইকলি অ্যাডভার্টাইজার কাগজে এই সব ব্যুরোর বড় বড় বিজ্ঞাপন থাকে। এমনি একটা বড় ব্যুরোর নাম হল ই. ভি. গিবসন ব্যুরো। লণ্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রীট ও স্ট্র্যাণ্ড রোডে এদের বিরাট অফিস রয়েছে। এরা বিজ্ঞাপন দেয়: যতক্ষণ না আপনি একজন মনোমত বন্ধু পাবেন, ততক্ষণ আপনাকে আমরা বন্ধুর ঠিকানা দিয়ে যাব। আর একটি ব্যুরোর বিজ্ঞাপন: ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, যদি আপনার বয়স ২১ থেকে ৭০ বৎসরের মধ্যে হয়, তাহলে নিঃসঙ্গ থাকবার কোন দরকার নেই। আমাদের ব্যুরোর সদস্য হন।

অনেকে আবার সরাসরিই বন্ধু চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন। অবশ্য এ সব বন্ধুত্বের পরিণতি বিবাহে। যেমন একটি বিজ্ঞাপন: তরুণী। বয়স ২৬। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। কালো চুল। মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রাপ্তা, খুব অনুভূতিপ্রবণ। ২৫ থেকে ৩৭ বৎসরের পুরুষদের বন্ধুত্ব-প্রার্থী। উদ্দেশ্য—বিবাহ।

কিন্তু নিছক রোম্যান্টিক আনন্দলাভের সঙ্গী বা সঙ্গিনী—তার জন্যও ব্যবস্থা আছে ঢালাও। প্রতি বছর বসন্তকালে কতকগুলি

সংস্থা থেকে মিক্সড্ ট্যুর পার্টির আয়োজন করা হয়। এই সব পার্টিতে যতজন পুরুষ ততজনই মেয়ে। অবিবাহিত পুরুষ ও নারীদেরই মাত্র দলে নেওয়া হয়।

কিন্তু সঙ্গিনী লাভের জন্য সেই আমেরিকান যুবকটিকে যে পন্থা অবলম্বন করতে দেখেছিলাম, তা মনে থাকবে চিরকাল।

লণ্ডনে থাকতে একদিন দেখলাম, রাস্তার ধারে বিজ্ঞাপনের বোর্ডে একটা বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা: আমেরিকান যুবক। বয়স ২৭। আজ রাত্তিরের শোয়ে তাঁর সঙ্গে সিনেমায় যাবার জন্য (বই: বেন হুর, প্রথম শ্রেণী) তরুণীদের আহ্বান জানাচ্ছেন। যে-কোন সুন্দরী তরুণী তাঁর সঙ্গে হোটেলের—নং স্যুটে দেখা করতে পারেন। সিনেমা দেখার পর ডিনার খাওয়াও হবে।

বিজ্ঞাপনটি দেখে খুব তাজ্জব বনে গেলাম। ফারুকি বললে: এ বোধহয় রসিকতা করে কেউ দিয়েছে। আমি বললাম, চল হোটেলটি তো কাছে, দেখেই আসি। গেলাম হোটেলে। ঘর আছে কি-না দেখার ছুতো করে দোতলায় উঠলাম। আমেরিকান ছেলেটির ঘরের কাছে গিয়ে দেখি দরজায় লেখা একটা ছোট্ট নোটিস। তিন-চারটে মেয়ে সেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। নোটিসটিতে লেখা ছিল: সঙ্গিনী পেয়ে গেছি। এখন যাঁরা আসবেন, তাঁদের জন্য দুঃখিত।

লাউঞ্জের আর্দালিটা বললে: সকাল থেকে অন্তত জন কুড়ি-পঁচিশ মেয়ে ঐ আমেরিকান যুবকটির সন্ধানে এসেছে।

॥ পাঁচ ॥

এক নজরেই চেনা যায়। লম্বা চুল। গায়ে ঢিলে 'এডওয়ার্ডিয়ান' জ্যাকেট, পরনে বেগনি রঙের ড্রেনপাইপ প্যান্ট। পকেট হাতড়ালে এই মুহূর্তেই পাওয়া যাবে সাইকেলের চেন, চাকু আর কোমরে জড়ানো জাবদাই বেল্ট।

শুধু খোকারাই নন, সেই সঙ্গে খুকুমণিরাও আছেন। গায়ে তাদের মেটে রঙের কাউবয় জ্যাকেট, পরনে স্ল্যাকস্। এঁরা জোরে সিটি মারতে জানেন, পুলিসের তাড়া খেলে জোরে ছুটতে পারেন, বেশ কয়েক বোতল বিয়ার চোখ বুজে গিলতে পারেন। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় এই 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী'দের দেখলে সকলের পথ ছেড়ে দিয়ে তবে অন্য কথা। কী জানি, কি হতে কোন্ গুণাহ্ হয়ে যাবে। এঁরা যদি একবার রেগে যান তাহলে ত্রিভুবন রসাতল।

পথ দিয়ে চলছি। শহরটার নাম কার্ডিফ। বেশ রাত হয়ে এসেছে। লোকজন কম। অমনি বলা নেই কওয়া নেই, সামনে এসে দাঁড়ালেন মূর্তিমান এই খোকা-খুকুরা। এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হল্লা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে অজান্তে গিয়ে পড়েছি সপ্তরথী পরিবৃত অভিমন্যুর মত।

অমনি 'ইয়া-হু' গোছের হাঁক মেরে পথরোধ করে এসে দাঁড়ালেন ক'জন। তাঁদের পরনে কোন্ রঙের পোশাক ছিল জানি না, তবে আমি দেখেছিলাম সব হলদে। তবু সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করলাম—ইয়ে, আমাকে কি কিছু বলছেন?

একজন এগিয়ে এসে বললে: 'উয়াট্স্ দ্যু টিম প্লিজ?'

শুনে তাকিয়ে রইলাম হাঁ করে। এ আবার কোন্ ভাষা? ওয়েল্স, ইংরাজী না ফ্রেঞ্চ?

—টিম, টিম ? আমার হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে দিলেন ওঁদের একজন।

ভাবলাম, বোধহয় ঘড়িটা খুলে দিতে বলছেন। এবং সেই আজ্ঞা যথাযথভাবে পালন করা কর্তব্য কি-না সে সম্পর্কে যখন মনে মনে ভাবছি, তখন মনে হল টাইমকে হয়তো ওঁরা উচ্চারণ করছেন 'টিম' বলে। ঘড়িটা একটু দেখে জবাব দিলাম—টেন ফর্টি।

—থ্যাঙ্ক্‌।

পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি মুক্ত। খোকা-খুকুরা আবার হল্লা করতে করতে অন্যদিকে চলে গেলেন।

সব শুনে মিসেস কিমিনিস্কি বললেন : বাছা, নতুন মানুষ, রাত-বিরেতে বাড়ি ফিরো না। ওরা সব টেডি-বয়।

—আর ঐ মেয়েগুলো ?

—টেডি-গার্ল। ভেরি ব্যাড টাইপ অফ গার্ল। বিওয়্যার অফ দেম।

—বলেন কি ?

—তাহলে আর কি বলছি। এখন তবু একটু উৎপাত কমেছে। বছর চার-পাঁচ আগে যা দৌরাত্ম্যি বেড়েছিল পোড়ারমুখোদের—ড্যাকরাদের আবার পুলিস, সোলজার আর কালা-আদমিদের ওপর খুব রাগ।

বললাম—তাহলে তো খুবই সাবধান হতে হয়।

পুরনো খবরের কাগজের ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে টেডি-বয়দের কীর্তিকলাপের কথা কিছু জানা গেল। ১৯৫৫ সালের ২৩শে অগস্ট তারিখে স্ট্র্যাটফোর্ডশায়ারের এক সংবাদপত্র লিখেছে : 'স্ত্রীলোকেরা টেডি-বয়দের ভয়ে এত ভীত হইয়াছে যে, একাকী পথে বাহির হইতে পারিতেছে না। এমনকি সর্বদা দরজা বন্ধ করিয়া দিন কাটাইতেছে।' এই বছরের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে একদল টেডি-বয় একটি দোকান লুঠ করে ও ৯৯৯ ডায়াল করে পুলিসকে

জানায়, আমরা টেডি-বয় দোকান লুঠ করেছি, তোমরা যা পার করে নাও।

একদিন খবরের কাগজে একটা খবর পড়লাম। ষোল বছরের একটি মেয়েকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ধরা যাক তার নাম গ্যান্সী। গ্যান্সীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ এনেছে স্বয়ং তার বাবা। অভিযোগ হচ্ছে, গ্যান্সী অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে। তাও না হয় ফিরুক—ছেলেমানুষ ফূর্তি করবার এই তো বয়স। মাঝে মাঝে না হয় একটু রাত হলই, কিন্তু গ্যান্সী যখন বাড়ি ফেরে তখন সে যাকে বলে বেহেড মাতাল। 'মদমত্ত নিমেদত্ত' গোছের অবস্থা। কাজেই নেশার ঝোঁকে গ্যান্সী বাবা-মার উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি নিক্ষেপ করে সেগুলি আর যাই হোক বাইবেলের গস্‌পেল নয়। এবং দেখা যায় এমতাবস্থায় কাঁচের বাসন-কোসনের ওপরই তার রাগটা বেশী। বাধা দিতে এলে মা-বাবাও উত্তম-মধ্যম থেকে বঞ্চিত হন না।

আর একটা খবর বেরিয়েছিল 'ডেইলি হেরাল্ডে'। খবর ঠিক নয়—চিঠিপত্রের কলমে একটা চিঠি। দুঃখ করে লিখেছে একটি মেয়ে। 'মহাশয়, আমার বালক বন্ধু (বয়-ফ্রেণ্ড) এক বৎসরের জন্য বাহিরে যাইতেছে। বিদায়ের আগের রাতটি আমি তাহার সহিত ছিলাম। সারারাত নহে—মাত্র বারোটা পর্যন্ত। কিন্তু বাড়ি ফিরিতেই, মা-বাবার সে কী রণচণ্ডী মূর্তি। যদিও সারারাত আমি বাড়ির বাহিরে থাকিতে চাহি না, তবু আমি কিছু স্বাধীনতা চাই।'

টেডি-বয়দের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমি আলাপ করে দেখেছি। মেজাজ বুঝে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে এমনিতে তারা লোক খারাপ না। কার্ডিফে আমি এক গলির মধ্যে একটা রেস্টুরেন্টের সন্ধান পেয়েছিলাম। সেটি টেডি-বয়দের আড্ডা ছিল। তার কারণ রেস্টুরেন্টটিতে একটি 'জুক-বক্স' আর একটি জুয়া খেলার মেশিন ছিল।

'জুক-বক্স' হল অটোমেটিক রেকর্ড-প্লেয়ার। পয়সা ফেলে দিলে পছন্দমত রেকর্ডের গান শোনা যাবে। আর জুয়া খেলার মেশিনটিতে পেনি ফেলে বোতাম টিপলে নসিব যদি ভাল থাকে তাহলে চার-পাঁচগুণ ফেরৎ আসবে। আখের মন্দ হলে আসল পয়সাও বরবাদ। এই দুটোই বিলেতের তরুণ-তরুণীদের প্রিয়, টেডি-বয়দের কাছে তো বটেই। আমার অবশ্য 'জুক-বক্স' শোনা বা টেডি-বয়দের সঙ্গে দোস্তি করার কোন লোভ ছিল না। আমি ঐ রেস্টরেণ্টে আসতাম তার কারণ তিন সিলিংয়ের মধ্যে ওখানে খাওয়া হয়ে যেত।

এই রেস্টুরেণ্টে লাঞ্চের সময় দলে দলে টেডি-বয়রা এসে জড় হত এবং এরা রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রোজ চিৎকার করে কোরাস গান ধরত।

একদিন মজা করার জন্যে পাশের একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, এখন সবচেয়ে বড় রক-এন-রোল আর্টিস্ট কে?

মেয়েটি একটুও না ভেবে জবাব দিল—এলুইস। পাশের মেয়েটি তিড়িং করে লাফিয়ে বললে—ধেৎ! এলুইস না ছাই, বিলি ফিউরি।

দুজনে তর্ক বেঁধে গেল। এ বলে তুই কি জানিস! ও বলে তুই কি বুঝিস! ওদের থামিয়ে দিয়ে বললাম—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাদের দুজনের কথাই থাকল। তোমরা আমাকে একটা পপুলার গান লিখে দাও তো। মেয়ে দুটি যে গানটি লিখে দিল—তা এলুইসেরও নয়, বিলিরও নয়—

স্টিভেন্স-এর হিট রক-এন-রোল—'সিক্সটিন রিজনস, হোয়াই আই লাভ ইয়্যু'।

মেয়ে দুটির একজনের নাম সিনথিয়া আর একজনের নাম মিচেল। একজনের বয়স ষোল আর একজনের বয়স উনিশ। দুজনেরই বালক-বন্ধু আছে। তবে সিনথিয়া বলল—সে একগাদা ছেলের সঙ্গে ঘোরা পছন্দ করে না। শত মক্ষিকার মাঝে আপন মন-ভোমরাটিকে সে দেহ-মন সমর্পণ করতে চায় না। কিন্তু মিচেল বলে—তোর মত

আমার অত ঢঙ নেই। একটি ছেলের বাঁদী হয়ে থাকব—সে হতেই পারে না।

এই রেস্টরেণ্টেই একদিন আলাপ হয়েছিল আর্থার ও পিটারের সঙ্গে।

আর্থারের বয়স সতেরো, লম্বা জ্যাকেট ও ড্রেনপাইপ পাজামা পরে সে। 'রক-এন-রোল' তার খুব প্রিয়। রক-এন-রোল শোনবার জন্য সে সপ্তাহে দশ শিলিং ব্যয় করে জুক-বক্সের পেছনে।

আমি—আর্থার, তোমার ফেভারিট আর্টিস্ট কে?

আর্থার—অ্যানিটা একবার্গ। তবে আমার ফিঁয়াশের পছন্দ ক্লিফ রিচার্ডকে। সে বুকে করে ক্লিফ রিচার্ডের ছবি নিয়ে ঘোরে।

আমি—তুমি চার্চে যাও?

আর্থার—একদিনও না।

আমি—হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কে তোমার কি মত?

আর্থার—আণবিক পরীক্ষা যতক্ষণ অন্য দেশ না বন্ধ করছে ততক্ষণ আমাদের ব্রিটিশদের বন্ধ করতে বলা উচিত নয়।

আমি—মা-বাবা সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?

আর্থার—অধিকাংশ বাপ-মা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের বুঝতে চেষ্টা করেন না।

এবার পিটারের পালা। পিটারের বয়স সতেরো। সে মার্কামারা টেডি-বয় নয়। খুব শান্তশিষ্ট গোছের ছেলে। প্রেসেস কোম্পানিতে শিক্ষানবিসের কাজ করে। গোয়েন্দা-কাহিনী পড়তে ভালবাসে।

আমি—ডিকেন্সের কোন বই কি পড়েছ?

পিটার—থ্রি মাস্কেটিয়ার্স কি ডিকেন্সের লেখা?

আমি—না।

পিটার—তাহলে মনে পড়ছে না তাঁর কোন বই পড়েছি কি না।

পিটার ছুটি পেলে সাইকেল চড়ে বেড়াতে বার হয়। মাসে একবার নাচে যায় ও হপ্তায় একবার সিনেমায় যায়। সিনেমা

ম্যাগাজিন কেনে এবং পড়ে। খবরের কাগজ একদম পড়ে না। পিটারের কোন 'রেগুলার গার্ল-ফ্রেণ্ড' নেই। তবে তার এক ফ্রেণ্ড আছে। তার সঙ্গে প্রেম হব হব করছে। দুঃখের বিষয়ে সে থাকে লণ্ডনে। কাজেই রোমান্সটা ভাল জমছে না।

আর্থারের মত পিটারও রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। রাশিয়ানদের সম্পর্কে তার বলার কিছুই নেই। তবে তার প্রশ্ন: ওখানে অত সিক্রেসি কেন? আমেরিকানদের সম্পর্কে তার মন্তব্য: তারা এক একজন 'বিগ হেড্স'।

পিটারের মা বাবা সবাই চাকরি করে। এক দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। আর এক দিদি এনগেজ্ড্। পিটার বাড়িতে সামান্য খরচ দেয়। বাকিটা সে খুশিমত খরচ করে।

ব্রিটেনের সামাজিক জীবনের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য কারা দায়ী?

বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার প্রচলন যে দেশে, সে দেশের কিশোরদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা যে বাড়ছে ও জ্ঞানের মান যে ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে পড়ছে তা সহজেই বোঝা যায়।

'ডেইলি মেল' মনে করেন: ধর্মের বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে বলেই এ হেন অবস্থা। হেড কনস্টেবল (কনস্টেবল অর্থে সেপাই নয়। হেড কনস্টেবল এক একটি শহরের পুলিস কমিশনার) মিঃ গুডচাইল্ডের মতে এসবের জন্য দায়ী সিনেমা ও টেলিভিসন। কারণ টেলিভিসনে অপরাধমূলক বই দেখানো হয়, সিনেমাতেও যৌন-আবেদনমূলক বই দেখানো হয় নির্বিবাদে। বিলেতে এক্স-মার্কা ছবি ('এ' ও 'এক্স'-এর মধ্যে তফাৎ হল ডিগ্রীর। এক্স-মার্কা ছবি মানে যৌন-আবেদনের মাত্রা যেখানে চূড়ান্ত) হাফ-প্যাণ্ট পরা ছেলেদের অবাধে দেখতে যেতে দেখেছি।

বিলেতে শতকরা ২৮ জন স্কুলের ছেলেমেয়ে হপ্তায় একবার সিনেমায় যায়।

হপ্তায় দুবার সিনেমায় যায় শতকরা ১২ জন স্কুলের ছাত্র।

সব মিলিয়ে মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার তিনভাগের একভাগ হপ্তায় একদিন বা একাধিক দিন সিনেমায় যায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা সিনেমা দেখে প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে বেশি। স্বল্প-শিক্ষিত পরিবারের ছেলেমেয়েরা ও স্বল্প-আয়ের ঘরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত ও ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি সিনেমা দেখে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, গৃহস্থ বধূ এবং অবসরপ্রাপ্ত লোকজনের চেয়ে বেশি সিনেমায় যায় কেরানী ও শ্রমিকরা। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি সিনেমা দেখে। গ্রামের লোকের চেয়ে শহরের লোকরা বেশি সিনেমায় যায়।

ছোটদের মনে যৌন-আবেদনমূলক ছবি কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে আঠারো বছরের একটি মেয়ে লিখছেঃ আমার বাবা-মা যেদিন আমাকে প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মার্কা ছবি দেখতে নিয়ে গেলেন, সেদিন আমার আনন্দ আর ধরে না। এই ছবির নায়ক যখন নায়িকাকে চুম্বন করছিল, তখন বেশ মনে আছে আমি হাতের কমলা-লেবুটি চুষছিলাম। আট বছর বয়সে অ্যাডভেঞ্চারস্ অফ রবিনহুড দেখে এরল ফ্লিনের প্রেমে পড়ে যাই। আমি তার বিভিন্ন ফটো সংগ্রহ করি। পরে আরও বড় হয়ে আমি বেডরুমে রীটা, বেটি গ্রেব্‌ল্ এবং অ্যালিস ফাইর ছবি টাঙাই।

কিন্তু মিসেস কিমিনিস্কি মনে করেন টেলিভিসনই হল যত নষ্টের গোড়া।

বললাম—অস্যার্থ ?

মিসেস—এই দেখ না, টেলিভিসন কি যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে—কোথায় মানুষ অবসর সময়ে নানা জ্ঞানের বই পড়বে, পাঁচজনের সঙ্গে

মেলামেশা করবে, তা না সন্ধ্যাবেলাই যে যার ঘরে কপাট দিয়ে টেলিভিসন শুনতে লেগেছে।

আমি—টেলিভিসনের মধ্য দিয়ে শেখার তো অনেক কিছু আছে।

মিসেস কিমিনিস্কি—তা আছে। কিন্তু বাছা, তা ক'জন শোনে? বি. বি. সি-তে যদি কোন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হয়, অমনি মিটার চেঞ্জ করে লোকে আই. টি. ভি. ধরে। সেখানে হয়তো 'কাউ বয়' হচ্ছে তখন। ওয়েলফেয়ার স্টেট। সাধারণ মানুষের চিন্তা করার কিছু নেই। রাষ্ট্র খেতে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে, ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নিয়েছে, অসুখ হলে চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে। আর কি চাই? খাও দাও আর হৈ-হল্লা করে মজা লোট।

আমি—তাতে অসুবিধার কি হল?

মিসেস কিমিনিস্কি—কিছুই হল না। বেশ কিছু টেডি-বয় হল দেশে আর বেশ কিছু 'ডোণ্ট-নো এর দলের সৃষ্টি হল।

আমি—'ডোণ্ট-নো' আবার কারা?

মিসেস—যারা খায় দায় আর বগল বাজিয়ে বেড়ায়। রাজনীতি হোক আর সিরিয়াস যে কোন বিষয়েই হোক, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বলে 'ডোণ্ট নো।' যেমন—

কিন্তু মিসেস কিমিনিস্কির চেয়েও 'ডোণ্ট-নো'-দের সম্পর্কে মজার গল্প বললেন প্রফুল্লবাবু।

'ডোণ্ট-নো'রা ঘণ্টায় ঘণ্টায় মত বদলায়। কিছুদিন আগে লিংকন কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। এই কেন্দ্রের ভোটারদের মধ্যে বিরাট সংখ্যায় 'ডোণ্ট-নো'রা আছেন। যে প্রার্থীর পোশাকের যত বেশী চেকনাই, প্রচারের যত বেশি ধুমধাড়াক্কা, এঁরা সেই প্রার্থীকেই ভোট দেবেন।

এদের একদল হয়তো ঠিক করল লেবার পার্টিকে ভোট দেবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ টেলিভিসনে কনজারভেটিভ দলের

একদল সুবেশা হলিউডী কেতার তরুণীদের আবির্ভাব হল। অমনি তারা বলে উঠল: 'আমাদের বদলে গেল মতটা।'

লিংকন উপনির্বাচনের কথা বলছিলুম। প্রার্থীরা সভা-সমিতি শুরু করেছেন, কিন্তু হালে পানি পাচ্ছেন না কেউ। অত বড় সভায় টেনে-টুনে পঞ্চাশ-ষাট জনের বেশি লোক জোটানো যাচ্ছে না।

এইসব দেখে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী করলেন কি একটা ঘোড়া ভাড়া করে ঘোড়ায় চেপে নির্বাচন-কেন্দ্রে ঘুরতে লাগলেন। ঘোড়া দিয়ে যদি ভোটারদের খোঁড়া করা যায়। সবাই তাতে বলল: 'তোমাকেই ভোট দেব।'

কিন্তু আর এক কাঠি এগিয়ে গেলেন লিবারেল-প্রার্থী। তিনি 'মিস লিবারেল' সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। নির্বাচন কেন্দ্রের সব জিন, পরীরা সেখানে ভিড় করল। তাদের দেখার জন্য আবার সাংঘাতিক ভিড়। সবাই বলল, 'লিবারেল দলের জয়-জয়কার! এই না হলে ইলেকসান।'

কিন্তু সকলকে টেক্কা দিলেন লেবার-প্রার্থী। তিনি খোদ লণ্ডন থেকে সাতজন সুন্দরী তরুণী আমদানি করলেন। তাঁরা কেন্দ্রের বুথে চক্কর মারছেন। তাঁদের ঘিরে দলে দলে নওজোয়ানদের ভিড় লেগে গেছে। তাঁদেরই একজন তরুণীদের বললে: গুড ইভনিং, তোমরা কে? পরিচয়টা জানতে পারি?

একজন তরুণী এগিয়ে এসে একটু মিচকি হেসে ভ্রূধনুভঙ্গ করে বললেন: গুড ইভনিং। আমরা সব শ্রমিক ললনা।

—গুড ইভনিং শ্রমিক ললনাবৃন্দ। আমাদের সঙ্গে একটু নাচবে?

—তোমরা কাকে ভোট দেবে?

—আমরা লিবারেলকে দেব।

—যদি লেবার-পার্টিকে দাও তাহলে তোমাদের সঙ্গে আমরা সবাই নাচব। কেমন, ভোটটা লেবারকে দেবে তো? এই বলে

তরুণীদের একজন রুমালে থুথু মাখিয়ে তা দিয়ে কালিমাখা ভ্রূটা একটু মেরামত করে নিলেন।

অমনি 'ডোণ্ট-নো'র দল বলে উঠল—অলরাইট, অলরাইট আমাদের সব ভোট লেবারের।

তরুণীরা এবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। বিলোল কটাক্ষ হেনে বললেন—'কাম অ্যাণ্ড ডান্স উইথ আস।'

॥ ছয় ॥

ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, পুরুষমানুষের কোন বয়স নেই। সে যা মনে করবে তাই তার বয়স। আশী বছরের বুড়ো যদি নিজেকে আটাশ বছরের ছোকরা ভাবে, তাহলে তার বয়স আটাশ বছর। তবে হ্যাঁ—মহিলাদের বেলা তা কখনও খাটে না। তাঁদের যে-রকম দেখাবে সে-রকমই তাঁদের বয়স। কুড়ি বছরেই যদি কেউ বুড়িয়ে যান, তাহলে তিনি নির্ঘাৎ বুড়ি। এ ম্যান ইজ অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ হি ফিলস্, উম্যান ইজ অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ সি লুকস্।

পঞ্চাশের পর মুনি-ঋষিরা নাকি মানুষকে বনে যাবার জন্মে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিলেতে পঞ্চাশের পর মানুষ বনে যায় না—যায় উপবনে। নাইট-ক্লাবে, নাচের আসরে, থিয়েটার-হলে, সিনেমায়, অফিসে, আদালতে, সমস্ত জায়গাতেই এমন নর-নারীর প্রাধান্য যারা জীবনের সেঞ্চুরি পূর্ণ করতে চলেছে।

আমার ল্যাণ্ডলেডি মিসেস উটনকে দেখি গাল তুবড়ে গেছে শুকনো ডাবের মত। মাথার চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে। বড় বড়া রেললাইনের মত লাইন কুঁচকনো কপালে।

কিন্তু এই মিসেস উটনের আর একটি রূপ দেখলাম। মুখে কড়া পেণ্ট, ঠোঁটে রঙ, ভ্রূ দুটো এমন করে আঁকা যেন মনে হচ্ছে এক জোড়া উত্তর মেরু। মাথায় একটা টুপি। পরনে একটি রঙ-চঙে গাউন আর হাতে একটা কালো রঙের ভ্যানিটি ব্যাগ। মিসেস উটনের অমন রূপ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর একটু থতমত খেয়ে বললাম—ইয়ে মিসেস উটন, এত সেজেগুজে কোথায় চললেন ?

মিসেস উটন ব্যাগ থেকে আয়নাটা বার করে একবার লিপস্টিক

বুলিয়ে অধর যুগল মেরামত করে নিচ্ছিলেন। একটু মধুর হেসে বললেন—এই দেখ না, একটা পার্টিতে যাব বলে বেরুচ্ছি—কি রকম বৃষ্টি এল। আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হতে চলল, এমন বেআদবী ওয়েদার আর দেখিনি বাপু।

মিসেস উটন পঁয়ত্রিশ বছর শব্দটির ওপর জোর দিলেন। বুঝলাম এটাকে আণ্ডারলাইন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর বয়স যে পঁয়ত্রিশ বছর, এটাই তিনি জানাতে চান। নয়তো বাইরে এমন কিছু বৃষ্টি পড়ছিল না। এর চেয়ে আরও বিশ্রী আবহাওয়া আমি বিলেতে দেখেছি। ওপরের ঘরে ফারুকি ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ গিয়ে বললাম—আরে ইয়ার শুনেছ, মিসেস উটনের বয়স নাকি পঁয়ত্রিশ বছর!

ফারুকি বলল—কে বলেছে?

—মিসেস উটন নিজে।

—কিন্তু ক'দিন আগে মিসেস উটন আমাকে নিজে বলেছে তার জন্ম ১৯১০ সালে। এটা হল ১৯৬০ সাল। তাহলে পনেরোটা বছর কি হল?

বললাম—দেখগে যাও, পাশের বাড়ির মিসেস ডাটনের বয়সের সঙ্গে হয়তো যোগ হয়েছে।

ফারুকি শুয়েছিল। লেপটা টেনে দিয়ে বলল—শোভানাল্লা! কালে কালে কত আদিখ্যেতাই না দেখব। আমার এই ত্রিশ বছর বয়স হল, এর মধ্যে কত জিনিসই না দেখলাম!

আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললাম—তোমার তিরিশ বছর বয়স?

ফারুকি বলল—তা নয় তো কি!

আমি বললাম—এই না তোমার পাসপোর্টে সেদিন লেখা আছে দেখলাম চল্লিশ বছর দু'মাস।

ফারুকি সে কথার উত্তর না দিয়ে নাক ডাকাতে লাগল।

পুরুষমানুষের বয়স নিয়ে অবশ্য মাথাব্যথা নেই। বয়সের জন্য তাদের কিছুই আটকাতে দেখি না। প্রফুল্লবাবু একটা গল্প বলেছিলেন। গল্পটা হল, লণ্ডনে এক নামকরা ডাক্তারের কাছে এক ভদ্রলোক এসেছেন চিকিৎসার জন্যে।

—আপনার রোগটা কি মশায়?

রোগী উত্তর করল—দেখুন, আমার নব্বুই বছর বয়স হতে চলল তবু আমি রাস্তায় সুন্দরী তরুণী দেখলেই তাকে ফলো করি।

ডাক্তার বলল—এতে দোষের কি আছে?

ভদ্রলোক বললেন—ডাক্তারবাবু, আমি অভ্যাসমত ফলো করি বটে। কিন্তু শেষকালে কেন ফলো করছি, কি জন্যে করছি, কিছুই মনে করতে পারি না।

চার্লস্ চ্যাপলিন যদি এ বয়সেও আবার ছেলের বাপ হতে পারেন, বারট্রাণ্ড রাসেলের যদি এ বয়সেও সত্যাগ্রহের প্রতি আগ্রহ জন্মায় আর স্বয়ং চার্চিল সাহেবের বুড়ো হাড়েও যদি ভেল্কি খেলে, তাহলে বয়স বলে যে একটা পদার্থ আছে, সে কথা ভুলে যেতে হয়।

চার্চিল সাহেবের আশীতম জন্মদিনে এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। এক প্রেস-ফটোগ্রাফার এসেছেন ফটো তুলতে। ফটো তোলা হয়ে যাবার পর ফটোগ্রাফার মশাই চার্চিল সাহেবের দীর্ঘজীবন কামনা করলেন।

বললেন—স্যার, আপনার জন্ম-শতবার্ষিকীতে আশা করি নিশ্চয়ই আমি ফটো তুলতে পারব?

চার্চিল সাহেব চুরোটের ধোঁয়া ছেড়ে একবার ছোকরার দিকে তাকিয়ে বললেন—নিশ্চয়ই পারবে। অবশ্য তুমি যদি ইতিমধ্যে তোমার স্বাস্থ্যের যত্ন নাও।

বিলেতে আমরা কিছুদিন সরকারের প্রচার-দপ্তরের অতিথি ছিলাম। প্রচার-দপ্তরের গাড়িগুলির অধিকাংশ ড্রাইভারই মহিলা। মহিলা বলতে তরুণী নয় বেশ বয়স্কা মহিলা। আমাদের পিসিমা-

ঠাকুমা এ বয়সে বাত আর অম্বলের একস্ট্রা স্পেশাল মাদুলি ধারণ করে রাত দিন বিছানায় শুয়ে আছেন, আর খিটখিট করে বাড়ি মাথায় করছেন। আর এ বয়সে এঁরা দিব্যি পুরুষের মত পোশাক পরে কী দারুণ স্পীডে মোটর হাঁকাচ্ছেন।

বিলেতে মহিলারা শুধু প্রাইভেট কার কেন, বাসও চালান। এই মহিলা ড্রাইভারদের সম্পর্কে ওদেশে অনেক গল্প আছে।

ড্রাইভিং টেস্টে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আচ্ছা, ট্রাফিক লাইটের কাছে এসে ড্রাইভার যদি ডান হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে কি বুঝবে?

পরীক্ষার্থী বলল—আজ্ঞে স্যার, ড্রাইভার পুরুষ না মহিলা?

পরীক্ষক বললেন—ধর মহিলা।

পরীক্ষার্থী জবাব দিলেন—তাহলে বুঝব, উনি পথের ধারের দোকানের শো-উইণ্ডোর দিকে ওঁর স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

প্রচার-দপ্তরের একজন মহিলা ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, মিসেস—

—আজ্ঞে না, আমি মিস। মিস টমসন।

—মিস টমসন, আপনি তো বেশ সুন্দর গাড়ি চালান।

মিস টমসন এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আর এক হাত দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। আর একটু মুচকি হাসলেন।

—বেশ স্পীডে চালান আপনি। ওয়াণ্ডারফুল!

—এ আর কি স্পীড দেখছ। পঞ্চাশ আবার স্পীড না-কি! আমি ষাটের কম চালাই নে। এমন রাস্তা পেলে স্যাটাসট্ সত্তর উঠে যাবে। কিন্তু বারণ আছে পঞ্চাশের বেশি যেন না চালাই।

মিস টমসন সবেগে একটা লরিকে ওভারটেক করলেন। গাড়িটা একটা বিরাট ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজলাম। মনে হল বোধহয় চোখ আর না খুললেও চলবে।

কিন্তু পরক্ষণেই শুনলাম খিল্ খিল্ করে একটা হাসির শব্দ। মিস টমসন হাসছেন।

—একদম ছেলেমানুষ দেখছি!

—মিস টমসন, আপনার বয়স কত হবে?

—পঁয়তাল্লিশ বছর।

—এমন কি আর বয়স আপনার?

—পঁয়তাল্লিশ বছর কম হল? মিস টমসন চটলেন।

—না। আমি তো তাই বলছি। পঁয়তাল্লিশ কি কম হল! এই বয়সে যে আপনি—

—কিছু না, কিছু না। জার্মানীতে দেখে এস, পঞ্চাশ-ষাট বছরের বুড়িরা ট্যাক্সি চালাচ্ছেন।

—আচ্ছা, আপনি বিয়ে করলেন না কেন, সারা জীবন অমন বিবাগী হয়ে—

—আরে ছোঃ! এই তো বেশ আছি। পড়াশুনো আর ড্রাইভিং নিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে। ছুটির দিনে বাস্কেট বল খেলি, সাঁতার কাটি, আর রাত্তে নাচের আসরে যাই। বেশ আছি।

অবশ্য খেলার মাঠে, স্যুইমিং পুলে আর নাচের আসরে কোন বৃদ্ধ গেলে, কেশে পাক ধরেছে বলে কেউ নজর করবে না। শিং ভেঙে বাছুরের দলে গিশেছে বলে কেউ নিন্দেও করবে না।

উইক-এণ্ডের দিন পার্কে পার্কে গিয়ে দূর থেকে দেখেছি, কয়েকটি ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করে খেলা করছে।

কাছে গিয়ে দেখা যাবে, হয়তো দুটো সত্যিকারের শিশু, আর দুজন বুড়ো শিশু—মানে শিশুর বাপ-মা। শনি-রবিবার হলেই আর কথা নেই। দম্পতীরা বাচ্চাদের নিয়ে চলে যাবে শহর থেকে দূরে, মাঠে। তারপর ছুটোছুটি করে খেলবে। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবে।

বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করবার নাকি অনেক ওষুধ আছে। প্লাস্টিক

সার্জারি করে হুঁকোর খোলের মত কত তুবড়ানো গাল লাউয়ের মত গোলগাল হচ্ছে।

গ্ল্যাণ্ড্ অপারেশন করে কত ধুমসি বুড়ি নাকি ছিমছাম খুকিতে পরিণত হচ্ছে। গ্ল্যাণ্ড্ অপারেশনের কথায় একটা পুরনো ঠাট্টা মনে পড়ল।

বুড়োবুড়ি গেছেন গ্ল্যাণ্ড্ অপারেশন করে আর ওষুধপত্র খেয়ে নবযৌবন লাভ করতে। কিছুদিন পরে বুড়োবুড়ির ছেলে দেখে দরজায় কে কড়া নাড়ছে।

দরজা খুলতেই দেখা গেল, একটি ছিমছাম তরুণী। কোলে এক শিশু।

ছেলে জিজ্ঞাসা করল—কে আপনি? কাকে চান?

ছিমছাম তরুণী বললে—সে কী খোকা, আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি তোর মা। অপারেশন করে ফিরে এসেছি।

—একদম চিনতে পারি নি। তা, বাবা কোথায়?

তরুণী কোলের শিশুটিকে দেখিয়ে বলল—এই তোর বাবা। দেখ না কি মুশকিল! ওষুধের ডোজ বেশি পড়ে গিয়েছিল, তাই এই অবস্থা হয়েছে।

লণ্ডনে প্রফুল্লবাবু আমাদের এ সব গল্প বলতেন। বলতেন—দেখুন না মশায়, এই তো হল অবস্থা। তার ওপর আবার ছেলে কি মেয়ে পোশাক দেখে অনেককে চেনবার উপায় নেই। এই ফ্যাশনটা মার্কিন মুলুক থেকে এসেছে। মেয়েদের মাথায় কদমছাঁট চুল, পরনে আঁটসাট পাজামা। এর ওপর গায়ে ওভারকোট দিলে কার সাধ্য বলুন তো মেয়ে বলে চেনে?

একদিন এক মজা হয়েছিল—বললেন প্রফুল্লবাবু। একদিন রিজেণ্ট পার্কে বসে আছি। পাশে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে এক ভদ্রলোক।

আলাপ জমাবার জন্যে বললাম—দেখেছেন, টেডি-বয়ের যা উৎপাত শুরু হয়েছে। ঐ যে পাজামা-পরা দুটো ছেলে ঘোরাঘুরি করছে, আমার সন্দেহ হচ্ছে ওদের টেডি-বয় বলে।

ভদ্রলোক ফোঁস করে উঠলেন—টেডি-বয় কাদের বলছেন? ওরা তো আমার মেয়ে!

আমি তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললাম—কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনি যে ওদের বাবা, আমি বুঝতে পারি নি।

ভদ্রলোক এবার আরও রেগে গিয়ে বললেন—বাবা বলছেন কাকে? আমি ওদের মা।

এইবার ভাল করে চেয়ে দেখলাম—হ্যাঁ তাইতো। পুরুষ নয়—আমার পাশে বসে জলজ্যান্ত এক মহিলা। কিন্তু এক নজরে বুঝবার উপায় নেই।

বাইরে থেকে মানুষের বয়স বোঝা যাক বা না যাক, তাতে কিছু যায়-আসে না। আসল বয়স হল মনের বয়স। বার্ধক্য আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মেজাজের পরিবর্তন হয়। একই মানুষ যুবক অবস্থায় এক রকম থাকে, বৃদ্ধ অবস্থায় অন্য রকম। একজন স্কটিশ ডাক্তার মনের দিক থেকে বুড়িয়ে না যাবার এক দাওয়াই বার করেছিলেন। ডাক্তারের নাম জেম্‌স্‌। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লেখেন। এবং ঠিক করেন যে ষাট বছর বয়সে তিনি চিঠিখানা খুলবেন।

চিঠিতে তিনি লেখেন—জেম্‌স্‌, আজ তোমার ষাট বছর। এই বয়সে তুমি বড্ড বেশি বক বক করবে। কথা কম বলতে শেখ। অপরের কথা শোন। ছোটদের অযথা উপদেশ দেবার প্রবৃত্তি জাগবে। এটা ভাল নয়। তোমার মেজাজ খিটখিটে হবে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে, অথচ তুমি তা কোনদিনই ছিলে না। তোমার কাছে অনুরোধ—তুমি একটু সহিষ্ণু হও।

কিন্তু বিলেতে বার্ধক্যের এ ছাড়াও আর একটা রূপ আছে। তা

হল তার নিঃসঙ্গ রূপ। ওদেশের নিয়ম হল—ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই ওরা আলাদা বাসা করে থাকবে।

বৃদ্ধ বয়সে মানুষ একটা অবলম্বন চায়। সে অবলম্বন হল, তার ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি। কিন্তু একমাত্র বড়দিনের সময় বা মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ ছাড়া বিবাহিত ছেলেমেয়ের বাড়িতে যাবার নিয়ম নেই।

সবচেয়ে মুশকিল হল তাদের, যারা বিপত্নীক কিংবা যাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তখন সেই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সকাল থেকে পার্কে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। ইংলণ্ডের পার্কগুলো এই সব নিঃসঙ্গ বৃদ্ধদের ভিড়ে ভর্তি হয়ে থাকে। বৃদ্ধরা সরকার থেকে বার্ধক্য-ভাতা পায়। অনেকে আবার সিনেমা-হলে গিয়ে সময় কাটায়। বিলেতের সিনেমা-হলগুলিতে একবার টিকিট কেটে ঢুকলে যতক্ষণ খুশি থাকা যায়। আর যে-সব বৃদ্ধরা বার্ধক্য-ভাতা পায় তারা তার কার্ড দেখালে হ্রাসমূল্যে সিনেমা দেখার টিকিট পায়। তাই সিনেমার ছুপুরের শো-গুলিতে বৃদ্ধদেরই ভিড় থাকে।

লণ্ডন অ্যাডভারটাইজারে মাঝে মাঝে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বিজ্ঞাপন দেন—সঙ্গী চাই, বা সঙ্গিনী চাই। উদ্দেশ্য—বিবাহ; পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধা। খুব উদার। স্বাস্থ্যবান। এই বয়সের পাত্রী চাই। ষাট বছরের বৃদ্ধা। প্রচুর টাকাকড়ি আছে। ধূমপান করেন না এমন একজন পাত্র চাই। পাত্রের বয়স পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মধ্যে হওয়া চাই।

অবশ্য টাকার লোভে অনেক বৃদ্ধেরও তরুণী ভার্যা জোটে। এ সম্পর্কে একটা গল্প মনে পড়ল। ষাট বছরের এক বৃদ্ধ তার বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইছেন—ভাই, আমার বয়স ষাট। তিন-চারটে কারখানার মালিক। প্রচুর সম্পত্তি। কুড়ি বছরের একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছি। ওর কাছে আমার বয়স যদি বছর দশেক কমিয়ে বলি, তাহলে কি ও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে?

বন্ধু জবাব দিল—কমিয়ে না বলে যদি বাড়িয়ে বল যে তোমার বয়স আশী বছর, তাহলে নিশ্চয়ই রাজী হবে।

রবিবার দিন গীর্জার সামনে এসে দাঁড়ালেই দেখা যাবে বহু প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। বহু প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধা কনে বউয়ের পোশাক পরে বরের হাত ধরে গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসছেন।

আর নেহাতই যে সব নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পাত্র-পাত্রী জোটাতে পারেন না, তাঁরা বন্ধু জোটাবার চেষ্টা করেন।

ফারুকি একবার গিবসন ফ্রেণ্ডশিপ ব্যুরোতে চিঠি লিখেছিল।

ফারুকি লিখেছিল ঃ আমি একজন পাকিস্তানী যুবক। বিদেশে এসে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছি। আমায় অভিজাত ঘরের বান্ধবী জোগাড় করে দিন।

ওরা ঠিকানা পাঠাল তুজন মহিলার। ফারুকি তো মহা খুশিতে খামটা ছিঁড়ল। ছাপানো তুটি নাম—মিস রবার্ট আর একজন মিস জোন্স। বিবরণে লেখা আছে, তুজনেই সুন্দরী, একজন আবার বিড়ি-সিগ্রেট খান না, আর একজন ভেজিটেরিয়ান, তুজনেই ভাল নাচ জানেন। মিস জোন্স আবার 'কালার বার'-এ বিশ্বাস করেন না, খুব উদার মহিলা।

কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল ফারুকির।

মিস রবার্টের বয়স লেখা পঞ্চাশ আর মিস জোন্সের বয়স পঞ্চান্ন।

॥ সাত ॥

এবারে আপনাদের বিলেতের যে পার্ক কথা বলে সেখানে নিয়ে যাই চলুন। না, না—ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। পার্ক নিজে থেকেই কথা বলে না। সত্যযুগ হলে নাকি বলত। কারণ সে যুগে গাছপালারা কথা বলত, জীব-জানোয়ারের মুখে খই ফুটত। কী ভয়ংকর সে সব দিন গেছে তা সহজেই অনুমান করতে পারছেন। একা মানুষের মুখে কথা ফুটে রক্ষে নেই, তার ওপর—

যাক সে সব কথা। যা বলছিলাম, যে পার্ক কথা বলে। আসলে পার্ক কথা বলে না, বলে মানুষেরাই। পার্কের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে। একজন দু'জন নয়—অনেক-অনেক।

পার্কটার নাম হাইড পার্ক। প্রফুল্লবাবু বলতেন: উইক-এণ্ডের কোন অলস বিকেলে হাতে অফুরন্ত সময় আছে, আকাশে সারাদিনের পর সোনালী রোদ্দুর উঠেছে, অথচ এমন দিনে প্যার করার মত কাছে-পিঠে কোন বঁধুযা নেই। এমনি দুঃসময় যদি আসে, তাহলে চলে যাবেন হাইড পার্কে। দাঁড়াবেন এসে স্পীকার্স কর্নারে। আধ ঘণ্টা থাকবার পরই গরম দিল একেবারে আইসক্রিম। যখন ফিরবেন তখন চুপসনো মেজাজ চাঙ্গা হয়েছে, ভাঙা দিল আবার জোড়া লেগেছে। হাইড পার্কের এমন দ্রব্যগুণ; বক্তাদের, মানে বক্তিয়ারদের এমনি বক্তৃতার তেজ।

হাইড পার্ক নাম হলেও এ পার্কে হাইড অ্যাণ্ড সিকের কোন ব্যাপার নেই। অন্তত স্পীকার্স কর্নারে কিছু নেই। সকলের অবারিত দ্বার, যে লণ্ডন শহরের নীতি 'ফেল কড়ি মাখ তেল' যেখানে মুফত্ সে কিছুই হবার উপায় নেই, সেখানে বিনামূল্যে এই বক্তৃতাবলী শ্রবণের সুযোগ সত্যিই একটা মস্ত বড় লাভ।

একদিকে অক্সফোর্ড স্ট্রীট—সামনেই টিউব-স্টেশন মার্বেল আর্চ, ওধারে নাইট্‌স্ ব্রীজের দিকে ঘুরে গেছে পথ। এধারে বেজওয়াটার রোড ধরে কুইন্সওয়ে স্টেশন পর্যন্ত মাইলখানেক ধরে হাইড পার্কের সীমানা।

কিন্তু শুধু আয়তন আর প্রকৃতি-শোভাই হাইড পার্কের বৈশিষ্ট্য নয়। রিজেণ্ট পার্ক আর হ্যাম্পস্টীড হীথ তো আরও সুন্দর, আরও মনোমুগ্ধকর।

হাইড পার্কের যা কিছু খ্যাতি তার স্পীকার্স কর্নারটুকু জুড়ে। মাত্তর কয়েক বর্গ গজ জায়গা। বড় জোর একটা ফুটবল মাঠের মত। সেখানে সারি সারি কেরোসিন কাঠের পোর্টেব্‌ল্ প্ল্যাটফর্ম পাতা। তার ওপর দাঁড়িয়ে এক-একজন বক্তা। তাদের এক একজনকে ঘিরে এক-এক ঝাঁক জনতা। এক-একটি চক্রব্যূহ। ঠিক যেমন কলকাতার ফুটপাথে ম্যাজিকওলাদের ঘিরে ভিড় হয়, তেমনি।

জনতা কিন্তু সুবোধ বালকের মত যাহা পায় তাহাই খায় না। বক্তৃতা কারু মনোমত না হলে রক্ষা নেই। বক্তারা যত শুনছে, ফোড়ন কাটছে তার চেয়েও বেশি। কখনও হাততালি দিচ্ছে। কখনও চেঁচিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। অবশ্য এর মাঝে উষ্মা যতটা, কৌতুক তার চেয়েও বেশি।

দেখে একটু অবাক লাগে। কারণ ট্রেনে, বাসে, টিউবে, যে ইংরেজ ধৈর্যের এক একখানি পাথর, সাত চড়েও মুখে রা নেই, হাইড পার্কে এসে তারাই একটুতে উত্তেজিত হয়ে উঠছে, মাথা গরম করছে।

হাইড পার্কে আমাকে প্রথমে নিয়ে এসেছিলেন আর্থার সাহেব। ভদ্রলোক ফারুকির বন্ধু। সেই সূত্রে আলাপ। পাকিস্তানী তরুণ। কাজ করেন বি. বি. সি-র উর্দু প্রোগ্রামে। আর্থার সাহেব বললেন: ফাঁক পেলেই আমি হাইড পার্কে চলে আসি। নিখরচায় মজা লোটার এমন ব্যবস্থা তামাম লণ্ডন শহরে কোথাও নেই।

আর্থার সাহেব নিয়ে এলেন একটি বক্তৃতার আসরে। বক্তা একজন টাক-মাথার প্রৌঢ়। বক্তৃতার বিষয়টি গরম। বিশ্ব পরিস্থিতি। তাঁকে ঘিরে একদল সরব জনতা।

বক্তা বললেন ঃ এমন একটা ক্ষেপণাস্ত্রের নাম করুন, যার দ্বারা আমরা রাশিয়াকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি। এই বলে বক্তা চশমার ফাঁক দিয়ে তাঁর দৃষ্টি ক্ষেপণাস্ত্রের মতই নিক্ষেপ করলেন শ্রোতাদের দিকে।

ঃ বলুন কী সে অস্ত্র ? বক্তা আবার প্রশ্ন করলেন।

ঃ পোলারিজ। কে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে উত্তর দিল।

ঃ কার দখলে ঐ অস্ত্র ? বক্তা এবার দ্বিগুণ জোরে প্রশ্ন করলেন।

ঃ আমার দখলে। ভিড়ের মধ্যে থেকে এডওয়ার্ডিয়ান পোশাক পরা একজন টেডি-বয় ফোড়ন কাটল।

তার এক হাতে আইসক্রিম, অন্য হাতটি একটি স্ল্যাক্স্-পরা টেডি-গার্লের কাঁধে।

জনতা হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু বক্তা একদম নার্ভাস হলেন না।

তিনি বললেন ঃ না, তোমাকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। পোলারিজ আর যাই হোক ইয়ং লেডি নয়।

জনতা ফিকফিক করে হাসছিল এবার খিক খিক করে হেসে উঠল।

এর পাশেই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিগ্রোদের সভা। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একজন নিগ্রো তরুণ। এই সভাতে কালো মানুষদের ভিড়ই বেশি। তবে সাদা চামড়ার লোকও বেশ কিছু আছেন। বক্তৃতা করছে একজন নিগ্রো তরুণ। একমুখ কালো দাড়ি।

ঃ তোমরা শয়তানের বাচ্চারা কি মনে ভেবেছ ? এখনও লণ্ডন শহরে অনেক বাড়ি আমি দেখাব, যেখানে কালো মানুষদের ঢুকতে

দেওয়া হয় না। বাড়ি-ভাড়ার বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে শুধু ইওরোপীয়ান, অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যাণ্ডারদের জন্য। তোমরা পাজি—তোমরা ভণ্ড—তোমরা—

ঃ ছুঁচো। কে একজন ফোড়ন কাটল।

ঃ হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমরা ছুঁচো। তোমরা আবার খ্রীষ্টানিটির বড়াই কর!

ঃ খ্রীষ্টানিটি সম্পর্কে আমার কিছু বলবার আছে। একজন শ্বেতাঙ্গ শ্রোতা চিৎকার করে জানাল।

ঃ তুমি খ্রীষ্টানিটির 'সি' পর্যন্ত বোঝ না। একজন কৃষ্ণাঙ্গ তার কথার প্রতিবাদ জানিয়ে উঠল।

ঃ আমি যা বুঝি তা তোমার মত দশটাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

ঃ আপাতত আমার বক্তৃতা বোঝবার চেষ্টা কর। বক্তা তাকে ধমক দিয়ে উঠলেন। সকলে হেসে উঠল। দু-এক কথায় বেশ জমে আসছিল বক্তৃতা, কিন্তু পাশের বক্তার চারপাশের শ্রোতারা কি একটা কথায় অমনি হাসির হুল্লোড় তুলল।

আর দেখবি দেখ—কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে চারপাশ একবারে ফাঁকা। পাশের বক্তার আসর তখন জমজমাট। সেখান থেকে ক্রমাগত হা-হা হু-হু হাসির শব্দ আসছে।

এখানকার বক্তৃতার বিষয় ধর্ম। ঈশ্বর আছেন কি নেই। এইটেই আজকের আলোচনার বিষয়।

বক্তার পোশাক জীর্ণ। মাথায় একটা ফেল্ট-ক্যাপ। গায়ে রেইন-কোট। তিনি চিৎকার করে চলেছেন প্রাণপণে।

ঃ ঈশ্বর বলেছেন…

ঃ তোমার মুণ্ডু! ঈশ্বর কিছুই বলেন নি। একজন শ্রোতা ফোড়ন কেটে উঠল।

ঃ আমি জানি পরমপিতা—

ঃ তুমি কিছুই জান না। তুমি একটা উন্মাদ। তুমি শুধু বিশ্বাস কর। এবার রোগা ফ্যাকাশে মত এক রাগী ছোকরা এগিয়ে এল।

ঃ ঈশ্বর তোমাকে অভিসম্পাত দেবেন—

ঃ আর এই রাবিশ বক্তৃতার জন্য তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন, তাই না?

হাইড পার্ক এমনি ভাবে কথা বলছে প্রায় একশো বছর ধরে। ১৮৭২ সালে সরকারীভাবে এই স্থানটি জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত হয়। সেই থেকেই হাইড পার্ক বক্তাদের খাশদখলে।

ব্রিটেনের রাজনীতিতে যে-সব উপদলেরা সাধারণত পাত্তা পায় না তারাই সাধারণত হাইড পার্কের নৈমিত্তিক বক্তৃতার আসর জমজমাট করে তোলে। এনার্কিস্ট পার্টি থেকে ফেবিয়ান সোসালিস্ট, বলশেভিক থেকে হিউম্যানিস্ট, কত দল যে হাইড পার্কে এসে ভিড় জমায়, তার ইয়ত্তা নেই। চেস্টারটন একবার রসিকতা করে বলেছিলেন, হাইড পার্কে এসে হাত-পা ছুঁড়ে আস্ফালন করতে পারেন না একটি মাত্র ব্যক্তি—তিনি ব্রিটেনের রাণী।

রাজনীতি আর ধর্ম—হাইড পার্কে প্রধান আলোচনার বিষয় হল এ দুটি। ধর্মের ওপর শুধু বক্তৃতাই নয়—ধর্মসংগীতেরও ঢালাও ব্যবস্থা। স্যাল্‌ভেশন আর্মির ধর্মসংগীত। এখানে গাউন-পরা বুড়িদের ভিড়ই বেশি। প্রায় ডজন তিনেক বৃদ্ধা যখন ফোকলা মুখে কোরাস গান শুরু করেন, তখন সত্যিই তা উপভোগ করার মত।

হেদো এবং গোলদীঘি থেকেই যেমন চ্যানেল সাঁতারুরা বের হয়েছেন, তেমনি হাইড পার্ক থেকে বেরিয়েছেন অনেক নামজাদা পার্লামেন্টারিয়ান—বাঘা বাঘা বক্তা। এখনও পার্কের খানদানী বক্তাদের নামের তালিকায় আছেন ডাঃ ডোনাল্ড সোপার। ভদ্রলোক একজন সোসালিস্ট ধর্মযাজক। আমেরিকায় যেমন খ্যাতি, তেমন ইংলণ্ডেও।

স্পীকার্স কর্নারের অখ্যাত কয়েকজন বক্তাকে আমি চিনতাম। তাদের একজনের নাম বাপাট। বাপাট পূর্ব-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়। চেহারার দিক থেকে নধরকান্তি। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। বাপাট লণ্ডনে কোথায় থাকে, কেউ জানে না। কতদিন ধরে এখানে আছে, তাও কেউ জানে না। বক্তৃতা দেবার সময় বাপাট একটি চমৎকার কৌশল অবলম্বন করত। ওর বক্তৃতায় কেউ যদি বাধা দিত, বাপাট তাকে অপ্রস্তুত করে থামিয়ে দিত।

হয়তো একজন কৃষ্ণাঙ্গ ওর কথার প্রতিবাদ করেছে। বাপাট বলত—মিস্টার ন্‌ক্রুমা, প্লিজ স্টপ! ভারতীয় হলে বলত: মিস্টার নেরু, মিস্টার গাণ্ডী, প্লিজ স্টপ! শ্বেতাঙ্গ হলে বলত: মিস্টার চার্চিল, আপনি কি দয়া করে আমাকে কিছু বলতে দেবেন? শ্রোতারা সবাই হেসে উঠত বাপাটের বলার ভঙ্গি দেখে। যারা তার বক্তৃতার প্রতিবাদ করতে যেত, তারা শেষ পর্যন্ত হালে পানি পেত না।

বাপাটের একজন বন্ধু ছিল। জ্যামিকান। কত বয়স দেখে বোঝা যেত না। তার নাম অর্লাণ্ডো। সে বাপাটের বক্তৃতার সময় ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকত। জ্যামিকান অর্লাণ্ডো বলত: এখন আর কী দেখছ? একদিন হাইড পার্কের ছিল বোলবোলাও অবস্থা। তখন বক্তৃতার কি ধার ছিল। এখন সব ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। ছো ছো—এ-সব আবার স্পীচ নাকি!

স্পীকার্স কর্নারের আর একজন বক্তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তার নাম আমি জিজ্ঞাসা করিনি। তবে তাকে আমি ডাকতাম জন বুল বলে।

জন বুল গায়ে একটি অপরিচ্ছন্ন ড্যাফোল কোট ও মাথায় ব্যারেল টুপি পরে বক্তৃতা করত। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল ধর্ম। ধৈর্য তার অসাধারণ। কোন শ্রোতা না থাকলেও সে ফাঁকা মাঠে একাই বক্তৃতা করে যেত।

জন বুল লণ্ডনের ইস্ট-এণ্ডে থাকত। একটি কার্পেণ্টারি শপে কারিগরের কাজ করত। গত যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তারপর ১৯৬০ সাল থেকে হাইড পার্কে জন নিয়মিত বক্তৃতা দিয়ে আসছে। ছোটবেলা থেকে জনের ইচ্ছা ছিল সে এম. পি. হবে। ফক্স, পীল, এডমণ্ড বার্ক, ন্যুই বেভিন এদের সমকক্ষ কেউ হবে। কিন্তু তা আর হল না। জন তাই পার্লামেণ্ট স্কোয়ারে না গিয়ে হাইড পার্কে এল।

জন বলত ঃ জান, বক্তৃতা দেওয়া হল গিয়ে তোমার মস্ত বড় আর্ট। পাবলিকের সেন্টিমেণ্ট বুঝতে হবে সব থেকে আগে। আর বক্তা হল যেন কোন অর্কেস্ট্রার কণ্ডাক্টর। তাকে টিউনের তালে তালে বক্তৃতা দিয়ে যেতে হবে। কখনও সুর চড়াতে হবে, নামাতে হবে, শ্রোতারা কত প্রশ্ন করবে, তার জবাব দিতে হবে। আর চাই একটু পড়াশোনা—এই পর্যন্ত বলে জন বুল একবার আমার দিকে তাকাত, তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বলত ঃ আরে, এ তো আর মে-ডের লেবার পার্টির মিটিং নয় যে, যা বললাম তাই লোকে অকাট্য বলে মেনে নিল। এ বাবা পিপল্‌স্ পার্লামেণ্ট! খোদ হাইড পার্কের বক্তৃতা। চাট্টিখানি কথা নয়। কই, আসুক তো দেখি এখানে চার্চিল কিংবা উইলসন বা ফ্রাঙ্ক কাজিন?

আর একজন বক্তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তার নাম টমসন। টমসন একটা বিরাট প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করত। তাকে অনেক দূর থেকে দেখা যেত।

টমসনকে একদিন বললাম ঃ আহা! বক্তৃতা করে বটে জন বুল। প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

টমসন বললে ঃ জন বুলটা আবার কে?

বললাম ঃ ওই যে, রোগা মতন লোকটা। ধর্মের ওপর বলে। তোমার পাশেই তো ওর প্ল্যাটফর্ম। আহা, কি সুন্দর বক্তৃতা! যেমন 'মোশান' তার, তেমনি 'ফিলিংস'—

টমসন খ্যাঁক করে উঠে বললে : কে, ওই জনটার কথা বলছ ? আরে, ওটা বক্তৃতার কিছু বোঝে ? ও তো বদ্ধ পাগল।

আমি বললাম : না না, কি যে বল, পুরো 'সেনম্যান'। কি অকাট্য যুক্তি। ও কি কখনও পাগল হয় !

এবার টমসন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল : আরে, আমি ওকে চিনি না ? আমি আর ও একই পাগলা-গারদে তিন বছর ছিলাম। ও ছাড়া পায় আমার এক বছর আগে। ফিরে এসে দেখি ব্যাটা একেবারে হাইড পার্কে দিব্বি জমিয়ে বসেছে। আরে ছো-ছো !

॥ আট ॥

এলিসকে জিজ্ঞাসা করলাম : কী গো মা-লক্ষ্মী, ক'দিন ধরে দেখছি মনে খুব ফূর্তি। নেচে নেচে বেড়াচ্ছ, ব্যাপারখানা কী ?

এলিস মুখ ভার করে বললে : বা রে, আমায় আবার গোমড়ামুখী দেখলে কবে ?

মাথা চুলকে আমি বললাম : তবু ইদানীং একটু ইতর-বিশেষ বলে মনে হচ্ছে না কি ?

এলিস বললে : জান, আমি একটা চিঠি পেয়েছি—

বললাম : লণ্ডনে তোমার সে চাকরিটা হয়ে গেছে বুঝি ? না, তোমার সে ভিয়েনার বান্ধবীটি—ডেলাইলা না কি নাম যেন—

এলিস বললে : নিকুচি করেছে লণ্ডনের চাকরি আর ভিয়েনার বান্ধবী ! চিঠি লিখেছে জন।

—ওহোঃ, তা আগে বলতে হয়—তা এলিস, জনের সঙ্গে তো তোমার দুবেলা দেখা হচ্ছে। এই তো আজ সকালেই দেখলাম, বেচারা বৃষ্টির মধ্যে এসে হাজির—এর মধ্যে সে গেলই বা কখন, আর তার চিঠিই বা এল কখন ?

এলিস এবার সত্যি সত্যি রেগে গেল।

—নাঃ, তোমার ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকত ! বলি, এসব ব্যাপার চিঠি লিখে জানানোর নিয়ম।

—কোন্ সব ?

—নাঃ, আগে জানলে কে তোমার সঙ্গে কথা শুরু করত। শোন, জন আজ আমাকে ফর্মাল প্রোপোজ করেছে। আর সেই সব ব্যাপার চিঠি লিখে জানাবারই নিয়ম।

—তাই নাকি ? দেখি না কি লিখেছে ?

—হ্যাঁ তোমাকে দেখাই, আর তুমি অমনি কাগজে বার করে দাও। আগে বল, কাউকে বলবে না?

—কাউকে না।

এলিস প্রিয়তমে,

যে কথাটি আমি তোমাকে বলতে চাই, তা শুধু তোমার ও আমার। আমি অনুমান করছি, আমি তোমায় কি বলতে চাই, তা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ। আমি মনে করি না কোনদিন কোনকিছু আমি তোমার কাছে লুকিয়েছি। এই সহজ সত্যটি হল এই যে, আমি তোমাকে ভালবাসি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জানতে না পারছি যে তুমিও আমাকে ভালবাস কি-না, ও আমায় বিয়ে করতে রাজী আছ—ততক্ষণ আমি মনে মনে বড় অশান্তি ও উদ্বেগ ভোগ করব। যদি তুমি বল হ্যাঁ, তাহলে এক মুহূর্ত দেরি না করে জবাব দিও। যদি তুমি আমায় আশা দিতে পার, তাহলে তুমি যা বলবে তাই হবে। উত্তর পেতে যেন দেরি না হয়, আমার ধৈর্যের সীমা বাঁধ মানছে না। ইতি— —প্রেমমুগ্ধ জন।

এলিসকে বললাম: এলিস, এখন বুঝলাম কথাটা সত্যি।

—কোন্ কথা?

—মানুষ কাশি, দারিদ্র্য ও প্রেম গোপন করতে পারে না।

এলিস রেগে বললে: তোমার সঙ্গে এইজন্যে কথা বলি না।

—যাই হোক, জন বেশ খাশা ইংরাজী লেখে।

—ও কী আর ওর লেখা! ওয়েডিং এটিকেটের বই দেখে টুকেছে। সবাই তাই করে।

—তাই নাকি, তাহলে এর উত্তরটাও তুমি—

—এটিকেট বই দেখে টুকব। সব মেয়েই তাই করে।

এলিস দেখলাম, তাই করল। কোথা থেকে একটা বই বার করে এনে টুকতে লাগল চিঠির উত্তর।

প্রিয় জন,

তোমার চিঠি বহন করে নিয়ে এল বিস্ময়। তবে অরাজী হবার মত তোমার চিঠিতে কিছুই লেখা নেই। আমি জানি না, আমার মনের চিন্তাকে কি ভাবে ভাষায় প্রকাশ করব। আমি খোলাখুলি ভাবেই তোমায় বলি, অনেকদিন ধরেই আমি তোমায় ভালবাসি। যখন এটি বুঝলাম যে তুমি আমার প্রতি আসক্ত, তখন আমি প্রার্থনা করেছিলাম যাতে আমি তোমার যোগ্য হতে পারি। আমি যেন তোমাব চিঠির উত্তরে সততার সঙ্গে বলতে পারি—'হ্যাঁ আমি রাজী'। ভালবাসা জেন। —তোমার এলিস।

এর পরে এল জনের চিঠি—লিখেছে, তার মানসিক দুশ্চিন্তার অবসান হল। জীবন তার কাছে খুব আনন্দদায়ক বলে বোধ হচ্ছে।

এলিসকে জিজ্ঞাসা করলাম : এবার কি করতে হবে?

এলিস বললে : এবার জন লিখবে বাবার কাছে চিঠি।

বললাম : সেটি কিমতি ?

এলিস ওয়েডিং এটিকেট বা বিবাহ-মঙ্গল পুস্তক থেকে গড়গড় করে খানিকটা শোনাল :

প্রিয় মিঃ জেনকিনস,

আপনি হয়তো অবগত আছেন যে, গতকাল আমি এলিসকে জিজ্ঞাসা কার যে সে আমাকে বিবাহ করিতে রাজী আছে কি না। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আপনাদের মত পাইলেই সে এ বিবাহে সম্মত আছে। আমি আমাদের এনগেজমেণ্ট ঘোষণা করিবার জন্য আপনার মতামত চাহিতেছি। আমার অবস্থা বেশ ভালই। বার্মিংহামে একটি ইস্পাত কারখানায় মেকানিকের কাজ করি। সপ্তাহে নয় পাউণ্ড করিয়া পাই। আমার বয়স ২৫। স্বাস্থ্যও খুব ভাল। আমার চরিত্র সম্পর্কে আপনাকে ও শ্রীমতী জেনকিনসকে সহজেই সন্তুষ্ট করিতে পারিব আশা রাখি। আমাকে যদি দয়া

করিয়া সাক্ষাৎকারের জন্য একদিন সময় দেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আরও ভালভাবে আমার সব কথা বলিবার সুযোগ পাইতে পারি। শ্রদ্ধা সহ— —আপনাদের জন টেলর।

দিন কয়েক আর এলিসের দেখা নেই, আমার ল্যাণ্ডলেডি বললেন ঃ হ্যাঁগা শুনছ, এলিসের যে বিয়ে—

—তাই নাকি! ও এসেছিল বুঝি?

—ওর আসতে বয়ে যাচ্ছে! ও তো এখন উড়ে বেড়াচ্ছে। আজকের কাগজে ওদের এনগেজমেণ্টটা বেরিয়েছে কিনা।

ল্যাণ্ডলেডি আমাকে 'এক্সপ্রেস আণ্ড স্টারে'র সেদিনের সংখ্যাটি পড়তে দিলেন। এনগেজমেণ্ট কলমে লেখা ঃ এতদ্দাবা ঘোষণা করা হইতেছে ব্রিজ নর্থ, স্ট্যাটফোর্ডশায়ার নিবাসী শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা এস. টেলরের প্রথম পুত্র শ্রীমান জনের সহিত, নর্থ রোড, উলভারহ্যাম্পটন নিবাসী শ্রী ও শ্রীযুক্তা জে. জনসনের দ্বিতীয় কন্যা এলিসের শুভ-পরিণয় শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে।

ল্যাণ্ডলেডি বলেন ঃ শেষ পর্যন্ত জনকেই ছুঁড়ির পছন্দ হল। মিসেস জনসন কতবার পই পই করে বারণ করেছিল। কত ভাল ভাল ছেলে ছিল। এক এঞ্জিনীয়ার ছোকরা তো কতদিন ধরে ঘোরাঘুরি করল। তা, যার সঙ্গে যার মজে মন—! এই আমাদের রাজকুমারী মার্গারেটের বেলাই দেখ না কেন! তা, তুমি আজ রাত্তিরে কি খাবে, ফিস্ না ল্যাম্ব-চপ?

এলিসের সঙ্গে দেখা হল কিছুদিন পরে। বাজার করতে গিয়ে। সঙ্গে মিসেস জনসন।

এলিস বললে ঃ ভেরি সরি, তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, সব শুনেছ বোধহয়?

আমি বললাম ঃ বিয়ের বাজার করতে বুঝি? তা, হাতে এটা কি ফর্দ? এলিসের হাত থেকে পেল্লায় ফর্দটা হাতে করেই দেখি লেখা আছে ঃ—

টপ কোট, স্পোর্টস কোট, ফার-কোট, রেন-কোট, ইভনিং কোট, টাউন স্যুট, স্পোর্টস স্যুট, ডে ড্রেস, ককটেল ড্রেস, ডিনার ড্রেস, ইভনিং ড্রেস, স্পোর্টস স্কার্ট, টেলর্ড স্কার্ট, স্পোর্টস গ্লাভস, ইভনিং গ্লাভস, স্পোর্টস ব্লাউজ, টেলর্ড ব্লাউজ, আফটারনুন ব্লাউজ, ইভনিং ব্লাউজ, জাম্পার্স, কার্ডিগানস্, টাউন হ্যাট, স্পোর্টস হ্যাট, ইভনিং হ্যাট, টাউন হ্যাণ্ডব্যাগ, স্পোর্টস হ্যাণ্ডব্যাগ, ইভনিং হ্যাণ্ডব্যাগ, টাউন গ্লাভস, সুইম স্যুট, ছাতা, টয়লেট পাউডার, ফেস পাউডার, ফেস ক্রিমস, টাউন স্টকিংস্, স্পোর্টস স্টকিংস, রুমাল, স্কার্ভস্, নখ-পালিশ, পারফিউমস, ক্লিনিং টিস্যুস, হ্যাণ্ডক্রীম।

এলিস বললে : লক্ষ্মীটি আজ বড় ব্যস্ত। তোমায় কার্ড পাঠাচ্ছি। বিয়েতে তোমার আসা চাই কিন্তু।

এলিস ও জনের বিয়েতে যে ভদ্রলোক বেস্টম্যান, তার সঙ্গে আলাপ হল। নাম জর্জ। বিলিতি বিয়েতে বেস্টম্যানই বরের ঘরের পিসী আর কনের ঘরের মাসী। জর্জ এর আগে অন্তত এক ডজন বিয়েতে বেস্টম্যান ছিল।

বললাম : ব্রাভো দাদা, কিন্তু আপনার নিজের বিয়েটা—?

জর্জ ওর টাক চুলকে বললে : তাহলে তো চাকরি থেকে স্যাক হয়ে যাব স্যার। একমাত্র ব্যাচিলাররাই বেস্টম্যান হতে পারে।

বুঝলাম সুরসিক হওয়াও বেস্টম্যানদের গুণ।

বেস্টম্যানের ওপর ভার বিয়ের সব ব্যবস্থা করা। গাড়ি ডেকে কনেকে চার্চে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে চার্চের বিল মেটান। দর্জির কাছে কনের জামা-কাপড়ের জন্য অর্ডার দিতে হলেও বেস্টম্যান। বিয়ের আগের দিন বেস্টম্যান কনের বাড়ি গিয়ে তদারক করে আসে, কোন কিছুর ত্রুটি ঘটেছে কি-না। বিয়ের দিন সকালে ছেলের বাড়ি এসে হাজির হবে বেস্টম্যান। তারা একসঙ্গে যাবে চার্চে ও কনে আসার জন্যে অপেক্ষা করবে। কনে এলে বিয়ের

সময় কনে হাতের দস্তানা খুলে জমা দেবে বেস্টম্যানের কাছে। বিয়ে হয়ে গেলে বর-কনে হাত-ধরাধরি করে চার্চ থেকে বেরিয়ে যাবে, তার পিছনে প্রধান ব্রাইড্স্মেডের হাত ধরে যাবে বেস্টম্যান। বিয়ের ভোজে টোস্ট উৎসর্গ করবে বেস্টম্যান। শুভেচ্ছা জানিয়ে বর-কনের নামে যে টেলিগ্রাম আসবে, তা পাঠ করে শোনাবে বেস্টম্যান।

বিলিতি বিয়ের খরচা কম। জর্জের কাছে দেখলাম বরের ঘর-খরচার এক ফর্দ।

এনগেজমেন্ট রিং	৫ পাউণ্ড	
বিয়ের আংটি	২ "	২ শিলিং
গায়ে-হলুদের তত্ত্ব	২ "	২ "
কনের হাতের ফুল	১ "	২ "
বরের মা-র হাতের ফুল	১ "	১ "
নিত কনের হাতের ফুল	১ "	১ "
পুরোহিত	১ "	১ "
বাজনা	৩ "	৩ "
গীর্জায় অর্গান বাজনার জন্য	১ "	১ "
রেজিস্ট্রী ফি	৩ "	৬ "
অন্যান্য	৫ "	
মোট	২৬ পাউণ্ড	১৯ শিলিং

ওদের বিয়ে হল এক রবিবারে। বিশুদ্ধ রোমান ক্যাথলিক মতে। চার্চের দরজায় দেখি নিত-কনেরা ফুলের তোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পরে বেস্টম্যান জর্জের সঙ্গে বর জন এল। বরের ডান দিকে থাকবে বেস্টম্যান। আধঘণ্টা পরে কনে এলিস এল। নিয়মমত কনের বাবা ধরল কনের ডান হাত, তার পিছনে পিছনে নিত-কনেরা। শোভাযাত্রা করে ওরা এগিয়ে চলল।

এইবার পুরোহিতের কথামত মন্ত্রপাঠ। বর ধরল কনের হাত।

বর বললেঃ আমি শ্রীমান জন, তুমি শ্রীমতী এলিসকে বিবাহিত স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, আজ হইতে সম্পদে বিপদে, ধনী অবস্থায় নির্ধনী অবস্থায়, রোগে, ভগ্ন-স্বাস্থ্যে আমৃত্যু তোমাকে দেখাশোনা করিব।

পুরোহিত বললেনঃ আই জয়েন ইউ টোগেদার ইন ম্যারেজ, ইন দি নেম অফ দি ফাদার অ্যাণ্ড দি হোলি ঘোস্ট। আমেন। পুরোহিত নব-দম্পতীর গায়ে পবিত্র শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। কনে তার হাত থেকে আংটি একখণ্ড সোনা ও রুপার সঙ্গে বাইবেলের ওপর রাখল। পুরোহিত তাতে মন্ত্রপাঠ করে পবিত্র করে দিলেন। বর সেটি কনের হাতে দিয়ে বললঃ এই আংটি দিয়ে আমি তোমায় বিয়ে করছি ও এই সোনা ও রুপার খণ্ড আমি তোমাকে দিচ্ছি। আমার সমস্ত দেহ দিয়ে তোমার পূজা করছি। আমার যা কিছু পার্থিব মঙ্গল, তা তোমাকে দান করছি। বর এবার আংটিটা কনের বাম হাতের আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললেঃ 'ইন দি নেম অফ দি ফাদার'। পরে অন্য আর একটি আঙুলে দিয়ে বললেঃ 'অ্যাণ্ড অফ দি সন'। আর একটি আঙুলে দিয়ে বললেঃ 'অ্যাণ্ড অফ দি হোলি ঘোস্ট'।

প্রেয়ারের পর বিবাহ শেষ হল। বিয়ের পর ওয়েডিং কেক কাটার পালা। কনে ধরল বরের হাত। তারপর সেই যুগ্ম হাত দিয়ে কাটা হল ওয়েডিং কেক। বর-কনে একটি করে টুকরো মুখে দিল। উপস্থিত সকলেরও জুটল এক-এক টুকরো। যে-সব নিমন্ত্রিতরা আসতে পারেন নি, তাঁদের বাড়ি পাঠাবার জন্য রেখে দেওয়া হল কয়েক টুকরো।

বিয়ের ক'দিন পরে বৌভাত। বিলিতি ভাষায় রিসেপসন। ছেলে বা মেয়ে, যে-কোন বাড়িতেই বৌভাত হতে পারে। এলিসের বাড়িতেই বৌভাতের ব্যবস্থা হল।

বিলিতি বিয়েতে খানা-পিনার টেবিলেও এটিকেট। তবু রক্ষে,

বেশী লোক নিমন্ত্রণের রেওয়াজ নেই। একটি বড় টেবিলে যত লোক ধরে তত লোক।

প্রথমে বসবে বর-কনে। তারপরে বরের মা, কনের বাবা, পরে বরের বাবা ও কনের মা। কনের সামনেই থাকে ওয়েডিং কেক। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় টেবিলের ওপর ঠক ঠক শব্দ। সবাই চুপ করে গেল। এলিসের এক পুরনো বন্ধু উঠে দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর ভাষণ ছিল সরস। তাতে প্রচুর হাসির উপাদান ছিল। তারপর তিনি নব-বিবাহিত বর-কনের স্বাস্থ্যপান করার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানালেন।

উত্তরে জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল: আমি আমার স্ত্রীর যোগ্য হবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতিথিরা সবাই চলে গেলে, এলিস দেখি একখানি বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

—অত মনযোগ দিয়ে কি পড়া হচ্ছে?

—এই বইটা। নাম—ইওর নিউ হোম। প্রেজেণ্টেশন পেয়েছি।

পাতা ওলটাতেই দেখি লেখা—নব-বিবাহিত বর-বধূদের প্রতি উপদেশ।

যেমন: বরের প্রতি—

(১) কোর্টশীপের সময় তোমার ভাবী পত্নীর প্রতি যেরূপ সৌজন্য দেখাইতে, বিবাহের পরও তাহা দেখাইতে ভুলিও না।

(২) তোমার অবসর সময় এমন কাজে নষ্ট করিও না, যাহাতে তোমার স্ত্রীর কোন উৎসাহ নাই।

(৩) বাড়ি ফিরিতে দেরি হইলে মিথ্যা ওজর দেখাইও না।

(৪) সকালে বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় অবশ্যই তোমার স্ত্রীকে চুম্বন করিয়া যাইতে ভুলিও না।

(৫) তোমার আপিসের বিষয় কদাচ স্ত্রীর নিকট ঘ্যানর ঘ্যানর করিয়া শুনাইবে না।

(৬) সর্বদা আশা করিও না যে, তোমার স্ত্রী তোমার জন্য অনেক রাত জাগিয়া বসিয়া থাকিবে। সে-ও বাড়ির কাজে ক্লান্ত হইতে পারে।

(৭) কেবল নিজের কথাই স্ত্রীর নিকট বলিও না। স্ত্রীর কথায়ও কান দিবে।

(৮) খাবার দিতে দেরি হইলে বিরক্ত হইও না।

(৯) পয়সা-কড়ির ব্যাপারে নীচতা প্রকাশ করিও না।

কনের প্রতি উপদেশ—

(১) স্বামী সারাদিনের খাটুনীর পর তাতিয়া-পুড়িয়া বাড়ি ফিরিবামাত্র তাহাকে সংসারের ঝামেলার কথা বলিয়া জ্বালাইও না।

(২) বিবাহ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভাবিও না তোমার স্বামীকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিবার আর প্রয়োজন নাই। সব আপনা হইতেই হইবে মনে ভাবিবার কারণ নাই।

(৩) সংসার-খরচের বিল তৎক্ষণাৎ শোধ করিবে।

(৪) সংসার-খরচের টাকা সাজ-গোজের দ্রব্য কিনিয়াই উড়াইয়াই দিও না।

এলিস বললে: যত সব বাজে বাজে উপদেশ। স্ত্রীর কোন্ জিনিসটা স্বামীরা সবচেয়ে পছন্দ করে বলুন তো?

অনেক ভেবে বললুম: পতিপরায়ণা স্ত্রীই হল সকল স্বামীর আরাধ্য বস্তু।

এলিস বললে: ওসব বাজে কথা। স্ত্রীর আসল গুণ হল রাঁধতে জানা। যে মেয়ে যত ভাল রাঁধতে জানে, বিবাহিত জীবনে তারাই হয় তত বেশী সুখী।

এলিস টেবিল থেকে উপহারের আর একখানা বই নিয়ে বললে: এটিই হচ্ছে সেরা উপহার।

সেটি দেখি একটি সচিত্র পাক-প্রণালী। তলায় লেখা আছে: 'এ ওয়েডিং গিফ্‌ট্‌ ছাট উইল লাস্ট লাইফটাইম'।

॥ নয় ॥

রাজহাঁসের মত সাদা গলায় একটি করে নকল মুক্তোর মালা, সিঁদুর মাখানো ঠোঁটে জ্বলন্ত প্লেয়ার্স, পরনে ঝেল্লা দেওয়া ফিকে রঙের একটা গাউন, মাথায় পালকের মত নরম টুপি—রবীন্দ্রনাথ যে 'জলকে চল' বধূর কথা বলেছিলেন, বিলেতের পথে-ঘাটে তারা যে এ-বেশে দেখা দেবে তা কে জানত?

এঁরাই হলেন বিলিতি বধূ। আপনার স্ত্রী কি করেন এই প্রশ্নের জবাবে বিলেতের স্বামীরা হয়তো একটু গর্বের সঙ্গেই বলবেন—আমার উনি হচ্ছেন মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের খাস সেক্রেটারি, অথবা উনি হচ্ছেন সিটি লাইব্রেরিব চীফ লাইব্রেরিয়ান। কিন্তু যিনি বলবেন—আমার উনি হাউস-ওয়াইফ মানে বধূ, রাঁধেন আর চুল বাঁধেন, দেখবেন স্পোর্টস জ্যাকেট ফুঁড়ে সেই স্বামীব বুক একেবারে আল্পস্ পর্বতের মত উঁচু হয়ে উঠেছে।

স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ হলেও শুধু গৃহস্থবধূ হওয়া বিলেতে এখনও আলাদ ইজ্জতের ব্যাপার। হ্যাঁ, ইস্কুল বা কলেজের পড়া শেষ করে ত্ব-চার বছর চাকরি করবে মেয়েরা। এই উঠতি বয়সে হাঁড়ি-হেঁসেল ঠেলতে আর কার বা ভাল লাগে। বিয়ে মানেই নার্সিং হোম, পেরাম্বুলেটর, হরলিকস্ আর বেশ কিছুদিন খুশিমত উইক-এণ্ডে বাইরে যাওয়ার দফা গয়া। আর তাছাড়া এই বয়সে লাইফটাকে এন্‌জয় করার জন্যেও তো স্বাধীনভাবে কিছু উপার্জনের দরকার। যে রকম মাগ্‌গীগণ্ডার বাজার পড়েছে, হপ্তায় একদিন করে নাচতে গেলেই টাকা পাঁচেক খরচা, জাজ-ব্যাণ্ডের একটা রেকর্ড কিনতে গেলেই অমন খরচ। দৈনিক ত্ব প্যাকেট সিগারেটের দাম তো আরও বেশি। এছাড়া টুকিটাকি কত খরচা আছে। এই

বয়সটাই তো প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াবার বয়স। তা প্রজাপতির পাখনা জোড়ারই কি কম দাম! আইবল, আইল্যাস, লিপস্টিক, রুজের ওপর নিত্যি নতুন ট্যাক্স বাড়ছে। একটা পছন্দসই ফ্রক কিনতে গেলেই তো এক হপ্তার পুরো মাইনে। স্বাধীন ভাবে চলার দায় তো কম নয়। তার ওপর চাকরি করতে শুরু করেছ কি অমনি সবাই হাঁ হাঁ করে এসে পড়বে। বাড়িতে কিছু খরচ দাও। চ্যারিটিতে কিছু চাঁদা দাও। আজ অফিসের অমুক কলিগের বিয়ে, সবাই মিলে প্রেজেন্টেশন দেবে—পাঁচ শিলিং কনট্রিবিউশন দাও।

এ তো গেল স্বাধীনতার দায়—কিন্তু অনেকের আবার অন্য দায়ও আছে। স্বামী খুঁজে নিতে হবে ঝটপট। এ ব্যাপারে বড়জোর পরামর্শ দেবে গুরুজন—উপদেশামৃত বর্ষণ করবে। সেই মুখস্ত করা কতকগুলো ডু আর ডোন্ট-এর তালিকা। কিন্তু যুৎসই স্বামী পাকড়াও করা দাগী আসামী পাকড়াও করার চেয়েও যে কত কঠিন, সে কি আর অন্যে বুঝবে! যার জ্বালা সে-ই জানে!

বছর তিন চার খোলা আশমানে মনের সুখে ওড়ার পর বাসায় ফেরার পালা। বধূয়া থেকে তখন শুধু বধূ। মার্কস অ্যাণ্ড স্পেনসারের ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে যিনি এতদিন সেল্স্ গার্ল ছিলেন—মাথায় পালকের মত নরম টুপি, গলায় নকল মুক্তোর মালা আর লম্বা ওভারকোটে আপাদ-মস্তক মুড়ে একহাতে বালতি ব্যাগ আর অন্যহাতে পেরাম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে তিনি সেই দোকানেই আসেন শপিং করতে।

বিলেতের স্বামীরা ডিভিশন অব লেবারের প্রতি নিদারুণ আস্থাশীল। স্বামী দশটা পাঁচটায় অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটবেন, আবার ফেরার সময় গলদঘর্ম হয়ে বৈঠকখানা বাজার থেকে ইলিশ মাছ, মুগের ডাল আর পাঁচপো নৈনিতাল আলু কিনে সন্ধ্যা ছ-টার রাণাঘাট লোকাল ধরবেন, এবংবিধ অনাচার বিলেতে নৈব নৈব চ।

সেখানে কিছু কেনাকাটার মত কাজগুলো বধূরাই সেরে

স্বামীদের শ্রম লাঘব করে থাকেন। আমার বন্ধু অ্যালফ্রেড বেশ কয়েক বছর হল বিয়ে করেছে। বউ হল গৃহস্থবধূ মানে হাউস-ওয়াইফ। অ্যালফ্রেড কবুল করে বলল—আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি হয় না।

শুনে ফারুকির চোখদুটো কে. সি. দাসের রসগোল্লার মত হয়ে উঠল—আরে বড়া তাজ্জব কী বাত! তা ক' বছর হল আপনার শাদী হয়েছে মিস্টার ?

—তা, সাত বছর হয়ে গেছে। হার্ডল্স অব সেভেন ইয়ার্স পেরিয়ে এসেছি। মনে হচ্ছে বিয়েটা এ যাত্রা টিঁকে গেল।

—কিন্তু এই সাত সালে একদিনও কি কিছু চেল্লাচেল্লি হয় নি ? আমার বিবি তো সাতদিন অন্তর আমাকে তালাক দেবার ভয় দেখায়।

অ্যালফ্রেড স্যর উইনস্টন চার্চিলের মত মুখটা গম্ভীর করে বলল—বিয়েটা হল একটা কমপ্রোমাইজ, প্রথমেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ডিভিশন অব লেবার করে নিতে হবে। সানডে-স্কুলের সুবোধ ছাত্রের মত ফারুকি জিজ্ঞাসা করল—যেমন ?

অ্যালফ্রেড বলল—যেমন, বিয়ের দিন থেকেই আমরা আমাদের কাজ ভাগ করে নিয়েছি। ঠিক হয়েছে ছোটখাট বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেবার তা আমার গিন্নী নেবেন। আমি তার মধ্যে মাথা গলাবো না। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত যা নেবার তা আমি নেব। গিন্নী তার মধ্যে মাথা গলাবেন না।

ফারুকি বলল—ছোটখাট বিষয়গুলি কি ?

—যেমন, আমি এ চাকরিটা ছেড়ে অন্য একটা ধরব কি না, দৈনিক কি বাজার করতে হবে, ছেলেমেয়েদের কোন্ স্কুলে ভর্তি করব, এবার ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাব, কি কি পোশাক কেনা হবে—এই সব।

—আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ?

—সেগুলো হল, যেমন, এবারের টেস্ট খেলায় কারা জিতবে,

নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে লেবার পার্টির মধ্যে যে মতভেদ চলছে, তাতে কোন্ পক্ষ ঠিক, বার্লিন সমস্যার কতদূর কি হবে? এবারে খুব বেশি শীত পড়তে পারে কি না—এই সব।

সে যাই হোক, বিলিতি গৃহস্থবধূদের ওপর যে শুধু রান্নার ভার, তা নয়—বাজার করারও পুরো ভার, রোজ দুপুরবেলা স্বামীদের অফিসে পাঠিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গৃহস্থবধূদের শপিং করতে দেখা যাবে। অ্যালফ্রেড অবশ্য বলে—আমার স্ত্রী সাধারণত 'শপিং' কথাটা উচ্চারণ করে না। একদিন বেরুচ্ছে, জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁগা, কোথায় চললে, শপিং করতে নাকি? তা স্ত্রী জবাব দিলেন—শপিং করার মত সময় নেই, যাচ্ছি কয়েকটা দরকারী জিনিস আনতে। কিছুক্ষণ পরে স্ত্রী ফিরলেন বিরাট গন্ধমাদন ঘাড়ে করে। ভাগ্যিস শুধু দরকারী জিনিসগুলি আনা—শপিং হলে হয়তো পুরো একটা লরি লেগে যেত।

শপিং বলতে শুধু দিনের বাজার করাই নয়—বাজারে তো আরও টুকিটাকি কাজ থাকতে পারে। যেমন জুতোটাতে হাফসোল লাগাতে হবে, তার জন্য ছুটতে হবে মুচির দোকানে। রেডিওটা মেরামত করতে দেওয়া আছে, নিয়ে আসতে হবে। লণ্ড্রী ক'দিন হল জামাকাপড় দিয়ে যাচ্ছে না--একটু তাগাদা লাগাতে হবে। এ সবগুলোই করবেন হাউস-ওয়াইফ। পেরাম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে যাবেন। তারপর ফুটপাথে পেরাম্বুলেটর রেখে দোকানে ঢুকবেন। আর বিলিতি শিশুও দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ আর সুশীলের মত। পেরাম্বুলেটরে ঘুমিয়ে আছে যেন নির্বিকল্প সমাধিপ্রাপ্ত কোন পরমহংস। মুখে চুষিকাঠি লাগানো। মনের আনন্দে হয়তো সেটি চুষছে আর নীল চোখ মেলে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। এইটুকু বাচ্চা পর্যন্ত জানে—রাস্তায় শুয়ে কাঁদাটা এটিকেট-সম্মত নয়।

উলভ্যারহ্যাম্পটনে আমার আর এক বন্ধু এরিখ অনেকদিন থেকেই বলছিল ওর বাড়ি যাবার জন্যে। এরিখ আমার এক বন্ধু,

বিমান মুখুজ্যের সঙ্গে গুডইয়ার কোম্পানিতে বেশ ভাল চাকরি করত। এরিখ জাতিতে নরওয়ের লোক। কিন্তু অনেকদিন বিলেতে আছে। তার বউ ব্রিটিশ। ওদের একটি মেয়েও হয়েছে। বছর পাঁচেক বয়স।

এরিখ সম্প্রতি শহরের প্রান্তে একটা সুন্দর বাড়ি কিনেছে। বাড়িটা কিনেছে ধারে। শুনে অবাক হবার কিছু নেই। বিলেতে একমাত্র ইংলণ্ডের সিংহাসন ছাড়া আর সবই ধারে বিক্রয় হয়।

এরিখের এই সুন্দর বাড়িটাও ধারে কেনা। অসংখ্য প্রাইভেট কোম্পানি আছে যারা কিস্তিবন্দীতে বাড়ি কেনা-বেচা করে।

বাড়িতে অতিথি এলে বধূই অভ্যর্থনা জানাবেন—এটিই বিলাত বধূর শিষ্টাচার। এরিখের বউ মার্গারেট এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল—আসুন আসুন। তা, সিগারেট চলে মশাইয়ের? আমি অবশ্য কড়া সিগ্রেট খাই, তা আপনার জন্যে নরম গোছের কোন—

বিলেতে একমাত্র রাজ-পরিবারের বধূরা ছাড়া সম্ভবত বাকী সব গৃহস্থবধূদেরই নিজের হাতে রান্নাবান্না করতে হয়। অন্তত আমি বহু উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের বধূদেরও হেঁসেল ঠেলতে দেখেছি। তার কারণ রান্নার জন্যে ঠাকুর পাওয়া ওদেশে ঈশ্বর-প্রাপ্তির মতই দুর্লভ ব্যাপার। আমার ল্যাণ্ডলেডি মিসেস উটনের একজন ঝি ছিল। সে রোজ সকালে একবার করে আসত। মিসেস উটন তাকে মিসেস ট্রেম্বর বলে সম্বোধন করতেন ও এক টেবিলে বসে তার সঙ্গে চা খেতেন। মিসেস উটন তাঁর ঝিকে যেমন সম্মান করতেন, তেমন সম্মান তাঁর শাশুড়িকেও করতেন না।

এরিখের বউ মার্গারেটও নিজে হাতে রাঁধে। ঘর-কন্নার সব কাজই করে। অবশ্য রান্নাবান্না আর ঘরকন্নার কাজ বিলেতে এখন কেক খাওয়ার মতই সহজ। আমাদের দেশের বহু পুরুষের ভীতি-উৎপাদক 'ঝাঁটা' নামক বস্তুটি বিলেতের গৃহে অনুপস্থিত। তার বদলে ওদের আছে 'ভ্যাক-মেড'। সেটি চলে ইলেকট্রিকে। ঠেলাগাড়ির মত

কার্পেটের উপর দিয়ে শুধু ঠেলে নিয়ে গেলেই 'এত্তা জঞ্জাল' মিনিটের মধ্যে সাফ।

মার্গারেট বলল—চলুন আপনাকে রান্নাঘর দেখিয়ে নিয়ে আসি।

বিলিতি রান্না আমার ভাল লাগে না, কিন্তু বিলিতি রান্নাঘর আমাকে আকৃষ্ট করেছে। প্রফুল্লবাবু বলেন—বিলিতি বাড়িতে যে ছুটি দেখবার তা হল রান্নাঘর ও স্নানাগার।

রান্নাঘর তো নয় যেন ল্যাবরেটরি। মোজাইক করা মেঝের ওপর রবারের কার্পেট পাতা। সামনে গ্যাস-কুকার। একপাশে সিঙ্ক ইউনিট; সেখানে বাসনপত্র ধোয়া হয়। আর একপাশে ড্রাইং মেশিন। এপাশে ভেজিটেবল র‍্যাকে রান্নার আনাজপত্র থাকে। দেওয়ালে ঝোলানো ইলেকট্রিক টোস্টার।

মার্গারেটের দৈনিক রুটিন শুনুন। ঘুম থেকে ও একটু দেরি করেই ওঠে। তার আগেই এরিখ উঠে পড়ে চা বানিয়ে নিয়ে এককাপ খায়, আর প্রায় অধিকাংশ বাধ্য বিলিতি স্বামীর মত আর এক কাপ চা টিপটের ওপর রেখে বউকে জাগিয়ে দিয়ে বলে —ইওর বেড-টি ডার্লিং।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে এরিখ অফিসে চলে যায়, মার্গারেট তখন কাপড়-চোপড় কাচে। ঘরদোর সাফ করে। তারপর এগারোটা বাজলে রাঁধতে যায়। তিন-কোর্সের লাঞ্চ বানাতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। লাঞ্চের সময় এরিখ ফিরে আসে। একসঙ্গে ওরা লাঞ্চ খায়। এরিখ আবার চলে যায় অফিসে। মার্গারেট সে সময়টা ম্যাগাজিন পড়ে, জামাকাপড় ইস্ত্রি করে, বাজারে যায় বা পাশের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে খোশগল্পের আসর বসে। না, রাজা-উজির মারা হয় না আড্ডায়।

মার্গারেট বলল—নাথিং ইনটেলেকচুয়াল। ধরুন, এই বাক্সটার-গিন্নী বলল—তোমার বাচ্চার ক'টা দাঁত উঠল? আমি হয়তো জিজ্ঞাসা করলাম, লণ্ডন থেকে সিম্ফনী অর্কেস্ট্রার দল এসেছে, তোমার কর্তা

নিয়ে যাচ্ছে নাকি? মাঝে মাঝে পরচর্চাও যে একটু-আধটু করি না, তা হলপ করে বলতে পারব না মশায়। মাঝে মাঝে এরিখ ধমক দেয়—আবার গল্প জমিয়ে বসেছ! এদিকে আমি এসে ঘরে একা বসে আছি।

মার্গারেটকে বললাম: রাজনীতি-টীতিতে আগ্রহ আছে নাকি?

—রাজনীতি? ওই বস্তুটি সম্পর্কে আগ্রহ নেই অধিকাংশ মহিলারই। তবে আমি একটু-আধটু করি। কনজারভেটিভ পার্টির মহিলা-সমিতিতে আছি। তা ঐ নামে। কাজকর্ম খুব একটা হয় না।

মার্গারেট অবশ্য কোন মহিলা-সমিতির সদস্য নয়। বিলিতি বধূদের সব শহরেই একটা দুটো করে সমিতি। অনেকগুলি আছে কেন্দ্রীয় সমিতি। শহরে শহরে তার শাখা। এ-সব সমিতির উদ্দেশ্য হল—সদস্যদের মধ্যে মেলামেশা, তাছাড়া সোস্যাল ওয়ার্ক। যেমন হাঙ্গেরির রিফ্যুজিদের ছেলেমেয়েদের জন্যে সোয়েটার বুনে দিতে হবে, চিলিতে ভূমিকম্প হয়েছে সেখানকার বাস্তুহারাদের কিছু কম্বল দিতে হবে, অমুক অনাথ-আশ্রমের জন্যে কিছু টাকা তুলে দিতে হবে।

অমনি বধূরা স্বামীকে অফিসে পাঠিয়ে এই ব্যাপারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দেন। টাকা তোলার পদ্ধতিও বেশ। এক রবিবার দেখে কোন সদস্যার বাড়িতে কফি-পার্টি দেওয়া হল। নামেই পার্টি। আসল উদ্দেশ্য টাকা তোলা। এক কাপ কফি খাওয়ার জন্যে সেখানে পাঁচ শিলিংয়ের কুপন কিনতে হবে। এই টাকা যাবে ফাণ্ডে।

মার্গারেট এভাবে দু-একবার পার্টির মহিলা-সমিতির টাকা তুলেছে। তবে সে খুব অ্যাক্‌টিভ নয়। বিশেষ করে এখন মেয়েটি হওয়ায় সে আর বাইরের ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে পারে না।

ছেলে না হয়ে মেয়ে হওয়াতে মার্গারেট খুব খুশি। আমার এক বন্ধু অরুণ বাগচী বিলেতে থাকাকালে পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন বলে তাঁকে তাঁর ল্যাণ্ডলেডী সহানুভূতি জানিয়েছিলেন।—দুঃখ

কোর না ভাই। পরের বার নিশ্চয়ই মেয়ে হবে। মেয়ে হওয়াতে লোকসান তো নেই। বরং লাভ ষোল আনা। মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতে গিয়ে বাপের মাথার চুল পেকে যাবে না। স্বাবলম্বী দেশের মেয়ে নিজেই নিজের বর খুঁজে নেবে। ছোটবেলা থেকেই ঘরকন্নার কাজে মা-র সঙ্গে হাত লাগাবে।

একটু বড় হয়ে ইস্কুলটা ছাড়লেই সহজেই চাকরি পাবে। তখন যতদিন না বিয়ে হয় বাড়িতে খরচ দেবে। মাঝে মাঝে ছোট ভাইবোনদের ভাল-মন্দ খাওয়াবে। আর তার ওপরে গতিক যদি খুব সুবিধের হয়, তাহলে মেয়ের পিছু পিছু শাশুড়ি ঠাকরুণ গিয়ে জামাইয়ের বাড়ি উঠবেন। জামাই দুবেলা সেলাম ঠুকবে। আর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে শাশুড়ি ঠাকরুণ জামাইকে মাঝে মাঝে জ্ঞান দেবেন—ইয়ে জন, আমি বলি কি এসেক্সের ঐ বাড়িটা এখন তোমার কিনে ফেলাই উচিত। আর এবার ইস্টারের ছুটিতে শুনলাম স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছ—আরে স্কটল্যাণ্ড তো ঘরের পাশে, তার আগে তোমার উচিত কন্টিনেন্টটা ঘুরে আসা। আমি তো বিয়ের পর হনিমুনই করেছি কন্টিনেন্টে।

তাই বিলেতের পারিবারিক জীবনে শাশুড়ি একটা আতঙ্ক। শাশুড়ি মানে হরর অফ ড্রাকুলা। ড্রাগনের চেয়েও তা ভয়াবহ। এই ভীতি স্বামী ও স্ত্রী দুজনেরই।

মার্গারেট বলল—এ ব্রিটিশ গার্ল ওয়াণ্টস্ টু বি মিসট্রেস অফ হার হোম। সি ডাজ নট লাইক হ্যাভিং হাব মাদার-ইন-ল ট্রিটিং হার সন অ্যাজ এ বেবি।

তাই বিলেতে আজ ছেলের বউ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে আলাদা হয়ে যায় বউ নিয়ে। শাশুড়ি তার জন্যে অনুযোগ করেন না। এইটেই এখন নিয়ম। বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ি নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ছেলের নতুন বাসা গুছিয়ে দিয়ে আসে। যে অবস্থান কখনই শান্তিপূর্ণ হতে পারে না সে ধরনের অবস্থানে বিলেতের মানুষ বিশ্বাস করে না।

কিন্তু তাহলে কি হবে? বউ না হয় শাশুড়ির কবল থেকে রক্ষা পেল—কিন্তু স্বামী?

স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশে স্বামী মানেই আ-সামী। ওদেশে স্বামীদের অবস্থা বড় করুণ।

সপ্তাহ গেলে মাইনের সব টাকাটা খুশিমত খরচের জন্যে স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েই নিষ্কৃতি নেই, যদি বাড়িতে শাশুড়ি দেবী অধিষ্ঠান করেন। ব্যাপিকা-বিদায় মানেই সেই সঙ্গে স্ত্রীকেও বিদায়। অতএব স-সর্পেই সেই হতভাগ্যকে গৃহবাস করতে হয়।

বউয়ের প্রতি শাশুড়ির অনেক অত্যাচারের কাহিনী আমরা এদেশে প্রায়ই পড়ি। তেমনি জামাইয়ের ওপর শাশুড়ির অত্যাচার ওদেশে এখন প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে। সকল স্বামীই একটি বস্তু কামনা করেন। তা হল শাশুড়ির হাত থেকে অব্যাহতি। এ সম্পর্কে অসংখ্য কৌতুককর কাহিনীব ওদেশে প্রচলন।

এর মধ্যে একটা গল্প বলেছিলেন প্রফুল্লবাবু। অফিসে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো, কে?

—আজ্ঞে, আমি আপনার চাকর বলছি বাবু। আপনার তেতলার ঘরে আগুন লেগে গেছে? দমকলকে কি খবর দেখ?

বাবু রেগে বললেন: ইয়ার্কি পেয়েছিস? আমার ঘর জ্বলছে আর দমকলকে আগে খবর না দিয়ে তুই আমার সঙ্গে রসিকতা করছিস?

—আজ্ঞে কি করব বলুন? তেতলার ঘরে আপনার শাশুড়ি ঠাকরুণ রয়েছেন। তাই দমকলকে খবর দেব কিনা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

॥ দশ ॥

আমার হোটেলের ম্যানেজার বললেন, লণ্ডনে কেউ নতুন এলেই আমরা তাঁকে এই অমূল্য বস্তুটি উপহার দেই। মিঃ চ্যাটার্জী, আপনিও এটি নিয়ে আমাদের বাধিত করুন।

সবে মাত্র পৌঁচেছি লণ্ডনে। একেবারে যাকে বলে আনকোরা। ঘাটালের ছেলে প্রথম কালীঘাটে এলে যেমন হয় তেমন আর কি। হোটেল-ম্যানেজারের দান মাথায় তুলে নিয়ে দেখি সেটি একটি তিন ভাঁজে মোড়া রঙচঙে ছাপা কাগজ। তার ভেতরে একটি ম্যাপ। ম্যাপটা হল লণ্ডনের আণ্ডারগ্রাউণ্ড বা মাটির নীচের ট্রেন-পথের।

ম্যানেজার বলল, যত্ন করে রেখে দেবেন স্যার। হেলা-ফেলা করার জিনিস নয়। লণ্ডনে আপনার সবচেয়ে বড় বন্ধুকে আপনার কাছে সঁপে দিলাম।

কথাটা বুঝতে পেরেছিলাম পরে। গোলকধাঁধার শহর লণ্ডনে টিউব-ট্রেনের এই ম্যাপটি হল যেন ভগীরথের সেই শঙ্খ। সাউথ কেনসিংটন থেকে আপনি হয়তো চেয়ারিং ক্রশ-এ যাবেন, অথবা নটিংহিল গেট থেকে অক্সফোর্ড সার্কস। সে না হয় সিধে রাস্তা। পুলিসকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে। কিন্তু ভিক্টোরিয়া থেকে টোটেনহাম কোর্ট রোডে যেতে হলেই হয়েছে। তখন এই বিপদের সময় ভরসা হল টিউব-ট্রেন। এই ম্যাপেই দেখানো আছে, আপনাকে প্রথমে ট্রেন ধরতে হবে চেয়ারিং ক্রশের, তারপর সেখান থেকে ট্রেন বদল করে টোটেনহাম কোর্ট রোডে নেমে ভুস করে ওপরে ভেসে উঠতে হবে। পরার দেশ লণ্ডনে পরিবহন-ব্যবস্থার অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে এই টিউব-ট্রেন। দৈনিক কুড়ি হাজার যাত্রী এই ট্রেনে চেপে ঘুরে বেড়ান।

ওপর দিয়ে বাস—নীচে দিয়ে ট্রেন। কিন্তু লণ্ডনের বাসে যাঁরা চড়েন তাঁরা সকলের ঈর্ষার পাত্র। লোকটা বেশ আছে মশায়। কাজ-কর্ম নেই, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে আর বাসে চড়ছে।

যারা কাজের মানুষ, লণ্ডনের বাস তাদের জন্যে নয়। বাস নয় তো, যেন লাটসাহেব। আপনি লাইন দিয়ে মিনিটের পর মিনিট দাঁড়িয়ে আছেন। সব রুটের বাস আসছে, শুধু আপনার রুটের বাসটি বাদ। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আপনার পায়ে যখন বাত ধরার উপক্রম, তখন বাস এসে দাঁড়াল। কিন্তু বাসের কণ্ডাক্টর মানে তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যত জনের আসন তত জনের বেশি কাউকে নেওয়া হবে না। বাসের রঙ যদি সবুজ হয়, তাহলে অটোমেটিক দরজা যাবে বন্ধ হয়ে। আর যদি লাল হয়, তাহলে কণ্ডাক্টর আপনার প্রতি করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে ঘণ্টা দিয়ে দেবে।

আর একবার বাসে উঠলে তিন-চারটে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে রাখা ভাল। যদি অন্তত একটা রাখা যায়। কারণ লণ্ডনের বাসের গতি দেখলে ওদের চিড়িয়াখানার হাতীও লজ্জা পাবে। তাছাড়া ভাড়াও বেশি। টিউবে যেখানে ছ'পেনি ভাড়া, বাসের ভাড়া সেখানে নির্ঘাৎ তিন পেনি বেশি! এক কথায় লণ্ডনের বাস হল আমিরী চালের একটি মূর্তিমান বিগ্রহ। যেন সদাগরী অফিসের ওপরওয়ালার নজরে-ধরা কোন কর্মচারী। তিনি খুশিমত অফিসে আসেন, খুশিমত যান, মাসপয়লায় মোটা টাকা পকেটে পুরে শিস দিতে দিতে বাড়ি ফেরেন।

এদিক থেকে টিউব-ট্রেন হল খাটিয়ে কেরানীর দল। প্রতি মিনিটে হুড়মুড় করে এক একটি ট্রেন আসছে। হাজার হাজার যাত্রী উঠছে। হাজার হাজার যাত্রী নামছে। সকাল আটটা থেকেই এক-একটি ট্রেনে তিলধারণের জায়গা নেই। নেহাত পাদানীতে ঝোলা আর ছাদে ওঠা সম্ভব নয় বলেই বোধহয় সেটি কেউ করে না, কারণ ট্রেন চললেই দরজা বন্ধ। কিন্তু যতক্ষণ পা ফেলবার জায়গা থাকে, ততক্ষণ লোক ওঠার আর বিরাম নেই।

লণ্ডনের প্রতি পাড়ায় তুটি জিনিস অবশ্যই দেখা যাবে। একটি হল 'পাব্' আর একটি হল টিউব-স্টেশন। ওপর থেকে দেখলে মনে হবে সিনেমা-হাউস। দিব্যি আলোয় আলো। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফলের দোকান, কাগজের স্টল। ওপরেই টিকিটের কাউণ্টার। টিকিট কেটে লিফ্‌টে উঠুন।

এক একটি লিফ্‌ট্ পেল্লায় আকারের। হ্যাম্পস্টীড স্টেশনের লিফ্‌ট্‌টার আয়তন ১৮১ ফুট। ট্রাফালগার স্কোয়ারের নেলসন কলমের সমান উঁচু। লিফ্‌ট্ নয় তো, একটা বড় হলঘর। একসঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ জন লোক দাঁড়িয়ে মিটিং করতে পারে।

অটোমেটিক লিফ্‌ট্। ওপরে উঠেই দরজা খুলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ভেতরে সেঁধিয়ে পড়ুন। আধমিনিট পরেই টেপরেকর্ড-করা একটি বাণী শুনতে পাবেন—থ্যাঙ্ক ইউ প্লিজ, অস্থার্থ, আর উঠবেন না। অতঃপর লিফ্‌টের দরজা বন্ধ ও পাতাল-প্রবেশ।

বড় বড় স্টেশনে আছে লিফ্‌টের বদলে অটোমেটিক সিঁড়ি। একটি নামছে ওপর থেকে নীচে, আর একটি উঠছে নীচে থেকে ওপরে। লাইসেস্টার স্কোয়ার স্টেশনের সিঁড়িটা হল প্রায় আশী ফিট লম্বা। ঘণ্টায় দশ হাজার করে যাত্রী এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে পারেন।

লিফ্‌টে করে নীচে নামলেই সুড়ঙ্গর পর সুড়ঙ্গ পড়বে। এক-একটি সুড়ঙ্গ চলে গেছে এক-একটি প্ল্যাটফর্মের দিকে। সুড়ঙ্গর দেওয়ালে লেখা আছে কোন্ দিকের ট্রেন ধরতে গেলে কোন্ দিকের সুড়ঙ্গ ধরতে হবে।

প্রফুল্লবাবু বললেন, লণ্ডনের এই সুড়ঙ্গগুলো মালটি-পারপাস। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সুড়ঙ্গগুলো দিব্যি ট্রেঞ্চের কাজ করেছিল। প্রায় তু লক্ষ লোক আশ্রয় নিয়েছিল এই সুড়ঙ্গগুলোতে। তখন লণ্ডনের উনআশীটি টিউব-স্টেশন একেবারে ইভ্যাকুয়িতে ভর্তি। এই এত লোকের স্যানিটেশান, ডাক্তারের ব্যবস্থা, খাবার-দাবারের

ব্যবস্থা করতে হয়েছিল সরকারকে। আর ক্যান্টিনওয়ালারা তো লাল হয়ে গিয়েছিল। সাত টন শুকনো খাবার আর আড়াই হাজার গ্যালনেরও বেশি চা বিক্রী হয়েছে ওই ক'দিনে।

সুড়ঙ্গগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনেক। বাইরে সাংঘাতিক বরফ পড়ছে, শীতে জমে যাবার দাখিল, সুড়ঙ্গের ভেতর সুড়ুৎ করে নেমে আসুন। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, বান্ধবীকে নিয়ে যে একটু পার্কে বসে আদর করবেন সে উপায় নেই, সে সময়ে এই ভূগর্ভে প্রবেশ করুন।

সুড়ঙ্গকে তাজা রাখার জন্যে ওপর থেকে বাতাস এনে ছাড়া হচ্ছে। আবার পুরনো বাতাস বার করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতি মিনিটে পঞ্চাশ লক্ষ কিউবিক ফিট বাতাস বন্দী করে ওঁরা চালান করে দিচ্ছেন মাটির নীচে।

হাজার হাজার লোকের আনাগোনা লণ্ডনের সুড়ঙ্গপথে। হাজার হাজার লোক শুধু ছুটছে ট্রেন ধরবার জন্যে। ট্রেন থেকে নেমে আবার ছুটছে লিফ্‌ট্‌ ধরার জন্যে। কোন কথা নেই, বার্তা নেই, গোলমাল নেই। 'একটু চেপে দাদা', 'চোখটা কি পকেটে পুরে এসেছেন দাদু' ইত্যাদি সম্বোধন নেই। শুধু সুড়ঙ্গের কংক্রীট-করা মেঝেতে হাই-হিল আর বুটের শব্দ উঠছে খট্‌ খট্‌ খট্‌ খট্‌।

ট্রেনের ভেতরে উঠেও কারুর মুখে কথা নেই। সকলের হাতে খবরের কাগজ। সকলের মুখ ঢাকা কাগজে। তাড়াতাড়ি খবরগুলো পড়েই কাগজটা স্টেশনের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে যেতে হবে। এত প্রচণ্ড ভিড়, কেউ উঃ আঃ করছে না। 'শুনছেন দাদা, কাল সে কী কাণ্ড' বলে গাড়ি-শুদ্ধ লোককে শুনিয়ে কেউ পাড়ার কোন কেচ্ছা বর্ণনা করছে না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কোন কথা থাকলে কানে কানে বলছে।

দেখে-শুনে আমি ও ফারুকি বড় তাজ্জব বনে গেলাম। বললাম, ব্যাপারটা খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না তো! সাত চড়ে কারুর মুখে রা নেই। সে কী কথা! ফারুকি বলল, যত সব আদিখ্যেতা!

ভীড়ের মধ্যে এমন ঠেলে-মেলে উঠি, আমার করাচী হলে হাতাহাতি লেগে যেত। কিন্তু এখানে কেউ তাতে কোন কথা বলে না। আচ্ছা, কাল আর একবার পরীক্ষা করে দেখব।

ফারুকিকে অনেক করে বোঝালাম, যা করতে হয় বাড়ি গিয়ে কোর বাপু, এটা বিদেশ-বিভুঁই। আর তাছাড়া তুমি এদের অতিথি।

কিন্তু ফারুকি কথা শুনলে না।

অতএব লণ্ডনের টিউব-যাত্রীদের ধৈর্য ও ভদ্রতা পরীক্ষা করবার জন্য ফারুকি করল কি, ভীড়ের মধ্যে এক মহিলার পা চেপে দিল। মহিলাটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ভেরি সরি। তারপর একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে সরে গেল। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ফারুকি তারপর থেকে আর এক্সপেরিমেণ্ট করে নি।

তবে যাই হোক, বিলেতের লোকেরা ট্রেনে বা বাসে যাত্রীদের সঙ্গে কম কথাবার্তা বলতে পারলেই খুশি হন। প্রফুল্লবাবু আমাকে একটা মজার গল্প বলেছিলেন। ট্রেনে করে ইওরোপ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন এক আমেরিকান ভদ্রলোক। তাঁর আপার-বার্থে সহযাত্রী হলেন গিয়ে একজন ব্রিটিশ। আমেরিকান ভদ্রলোক তো মহাখুশি। যাক, সারা পথ তাহলে বেশ গল্প করা যাবে। কিন্তু ও হরি! প্রথম দিন ব্রিটিশ ভদ্রলোক কোন কথাই বললেন না। দ্বিতীয় দিন ওপর থেকে নেমে ল্যাভাটরিতে যাবার সময় ভদ্রলোক তাঁর সহযাত্রীর দিকে একটু চেয়ে 'গুড মর্নিং' বলে চলে গেলেন। তৃতীয় দিন গন্তব্যস্থলে ট্রেন এল। আমেরিকান ভদ্রলোক নেমে যাবার সময় 'গুড-বাই' জানিয়ে গেলেন ব্রিটিশ ভদ্রলোককে। ব্রিটিশ ভদ্রলোক অতি কষ্টে ম্যাগাজিনখানা নামিয়ে তিনদিনের মধ্যে সেই প্রথম একটি সেন্‌টেন্স পুরো উচ্চারণ করলেন, 'বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?'

ঠিক এই রকম আর একটি গল্প শুনেছিলাম আমার এক জার্মান বন্ধুর মুখে। একবার এক জাহাজ-ডুবি হয়ে গেছে মাঝ-দরিয়ায়।

জাহাজের ক'জন যাত্রী অতি কষ্টে সাঁতরে উঠল এক নির্জন দ্বীপে। যাত্রীদের মধ্যে আছে দু'জন স্কচ, দু'জন আইরিশ আর দু'জন ইংরেজ। দ্বীপে উঠেই স্কচ দু'জন মিলে একটা ক্লাব করে ফেলল, আর আইরিশ দু'জন ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে আরম্ভ করে দিল। কিন্তু মুশকিল বাঁধল দু'জন ইংরেজকে নিয়ে। তারা কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। আপন মনে চুপচাপ বসে থাকে। ব্যাপার দেখে বাকী চার জন তো অবাক। একদিন ওরা দল বেঁধে এসে জিজ্ঞাসা করল ইংরেজ দু'জনকে—কী ব্যাপার? তোমরা যে চুপচাপ? ইংরেজদের একজন খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, কী করব দাদা, আমাদের যে কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় নি!

লণ্ডন থেকে কার্ডিফ যাবার সময় প্রথম চাপলাম বিলেতের ট্রেনে। প্যাডিংটন, ওয়াটারলু, কিংস্‌ক্রশ, ইউস্টন আর লিভারপুল স্ট্রীট—এই পাঁচটি বড় বড় স্টেশন আমাদের হাওড়া স্টেশনের মত। এই পাঁচটি স্টেশনের সঙ্গে সারা ব্রিটেন ও গোটা ইওরোপের যোগাযোগ রয়েছে ট্রেন-পথে।

মেল-ট্রেনের নামগুলোও খুব জমকালো। 'দি রেড রোজ', 'দি রয়্যাল ওয়েসেক্স', 'দি রয়্যাল স্কট', 'দি ফ্লাইং স্কচম্যান'। 'ফ্লাইং স্কচম্যান' নিয়ে এক গল্প মনে পড়ে গেল। এক স্কচ ভদ্রলোক ছুটছেন লণ্ডনের কোন এক স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে। পিছনে কুলির ঠেলাগাড়িতে তাঁর মালপত্তর। কুলি বলছে, বাবু, আপনি কোন্ ট্রেন ধরবেন? ফ্লাইং স্কচম্যান?

ভদ্রলোক বললেন, আমিই হলাম ফ্লাইং স্কচম্যান। ভেবেছিলাম, দুদিনের জন্যে একটু বাইরে পালিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচব। কিন্তু দেখি তিনি স্টেশনে এসে হাজির। প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম আর কি!

বিলেতে রেলওয়ে চালান সরকার। শেষ লেবার গভর্নমেণ্টের আমল থেকেই রেল ওদেশে জাতীয়করণ করে নেওয়া হয়েছে। ওতে

যাঁরা গোঁড়া কনজারভেটিভ তাঁরা খুব অখুশি। তাঁরা বলতে চান—বিলিতি রেলে এখন বছর বছর লোকসান হচ্ছে। মালিকের হাতে থাকলে এটি আর হত নি। অন্যদিকে আর একদল বলছেন, বাপু হে, আমাদের দেশটি হল ওয়েলফেয়ার স্টেট। যাত্রী-সাধারণের সুবিধার জন্য যদি একটু লোকসান হয়ও তাতে ক্ষতি কি, আমরা অন্য জায়গায় ব্যবসা করে সেটা পুষিয়ে নেব।

এঁদের কথাই ঠিক। ব্রিটেনে রেলওয়ে-যাত্রীর জন্যে হাজার সুবিধা। এমনকি যাত্রীর সঙ্গে যদি কিছু মাল থাকে, তাহলে সামান্য কিছু দিলেই রেলের লোক তা বাড়ি থেকে নিয়ে আসে। আবার গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেয়। এ ছাড়া যাত্রীদের আকৃষ্ট করবার জন্য রেল যে-ভাবে বিজ্ঞাপন দেয়, তাতে মনে হয়, কোন হোটেল-কোম্পানি যেন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এত অসংখ্য ধরনের কনসেশন বিলেতের রেলওয়েতে যে, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা নেব তা ঠিক করতে মাথা খারাপ হবার দাখিল। স্টেশনে স্টেশনে লাল-নীল-হলুদ রঙের কাগজে ছাপানো লিফলেট বিলি হচ্ছে। তাতে স্টেশনের নাম লেখা, সেই স্টেশনে নেমে দেখবার কি আছে তা লেখা, দরকার হলে তার ছবি দেওয়া, কখন ট্রেন ছাড়বে কখন ফিরে আসবে ট্রেন, একবেলার মধ্যে ফিরে এলে কত কনসেশন—সমস্ত কিছু সে সব লিফলেটে বিস্তারিত ভাবে ছাপানো।

বিলেত দেশটা হল ভ্রমণ-পাগলের দেশ। একটু ছুটি পেলেই আর রক্ষে নেই। দলে দলে লোক দেখ শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। উইক-এণ্ডের দিনগুলো তো আছেই। শীতকালটা যা একটু মন্দা। তা নইলে উইক-এণ্ডের দিন কেউ বাড়ি বসে আছে, বিলেতে এটি ভাবাও যায় না।

দেশবাসীর মনে এই ছুটির নেশা ধরিয়ে দিতে অনেকখানি সাহায্য করেছে ও-দেশের রেল। হাজার রকমের কনসেশন—হাজার রকমের বিজ্ঞাপন। ত্রিশ মাইলের মধ্যে কোন স্টেশনে গিয়ে যদি

সেইদিনই ফিরে আসতে পারেন, তাহলে প্রতি শিলিংয়ে তিন পেনি করে কনসেশন। বেলা বারোটার পর যাত্রা শুরু করে যদি সেইদিনই ফিরে আসেন, তাহলে ভাড়া আরও কম। ক্লাবের টিম এক শহর থেকে আর এক শহরে খেলতে যাবে, শতকরা পঁচিশ টাকা করে কম দিন। সাইকেলে করে ভ্রমণে বেরুবেন? বেশ তো, আপনি ট্রেনে সাইকেল তুলে নিন। পছন্দমত এক স্টেশনে নেমে পড়ুন। তারপর সাইকেল করে ঘুরে অন্য স্টেশন থেকে ফের ট্রেন ধরুন—আপনার ভাড়া অনেক কম লাগবে। স্কুল-কলেজ বা ক্লাবের ছেলেমেয়েরা আউটিং করতে যাবেন? ব্রিটিশ রেলওয়ে বলছে, আপনার লোক যত বেশী হবে, আমাদের ভাড়া তত কম।

বিলেতে সমস্ত ট্রেন এখন বিদ্যুতে চলে না—বেশ কিছু চলে ডিজেলে, দূর-পাল্লার সব ট্রেন চলে স্টীমে। তবে আর কিছুদিনের মধ্যেই সব ট্রেন চলবে বিদ্যুতে। কিন্তু তাহলেও কোন ক্ষতি নেই। ট্রেনের কামরায় যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নানান বন্দোবস্ত। সারা ব্রিটেনে দিনে তেইশ হাজার ট্রেন চলছে। পাঁচ হাজার মোট ইস্টিশান। পাঁচ লক্ষ লোক ট্রেন চলায় সহায়তা করছে। এক-একজন যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে আছে পাঁচ লক্ষ মানুষ।

বিলিতি রেল-কোম্পানি ভারতে থার্ড ক্লাসের সৃষ্টি করে গিয়েছিল। কিন্তু খোদ বিলেতে ট্রেনে থার্ড ক্লাস নেই। মহাত্মা গান্ধীকে বোধহয় বিলেতের ট্রেনে চেপে বলতে হয়েছিল, আমি সেকেণ্ড ক্লাসে চাপছি থার্ড ক্লাস নেই বলে।

তবে ফার্স্ট ক্লাসের সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাসের তফাৎ হল শুধু আভিজাত্যে। নয়তো উভয় ক্লাসেই সমান পুরু গদি পাতা। তবে ফার্স্ট ক্লাসে এক একটি আসন সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। প্রতিটি ট্রেনের সঙ্গেই আছে 'পাব্'। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ যেখানে কোন ইওরোপীয় আছে, সেখানেই পাব্ আছে। তাই চলন্ত জাহাজে পাব্, চলন্ত প্লেনে পাব্, চলন্ত ট্রেনের ভেতরেও পাব্। পথশ্রমে ক্লান্ত

যাত্রীরা এই কামরায় ঢুকে খানিকটা গলা ভিজিয়ে নিতে পারেন। পাব্ ছাড়াও আছে রেস্টুরেন্ট।

বিলেতে ট্রেন-ভ্রমণকারীদের জন্যে বেশ কিছু ধরা-বাঁধা কাস্টম আছে। ভদ্রলোকমাত্রই সেগুলো মেনে চলতে বাধ্য। যেমন, কোন যাত্রী তাঁর আসনের ওপর সুটকেস, খবরের কাগজ, ওভারকোট ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি রাখলেই আসনটিতে তাঁর মৌরুসী পাট্টা কায়েম হয়ে যাবে। তারপর কোন যাত্রী যদি সেগুলো সরিয়ে আসনটি জবরদখল করেন, তাহলে তিনি ইংরেজ-সমাজে ধিক্কৃত হবেন।

আপনি যদি জানলার পাশে বসে থাকেন, তাহলে জানলাটি যে আপনার এজমালি সম্পত্তি তা মনে করার কোন কারণ নেই। হয়তো জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আপনি মনের আনন্দে চাঁদ দেখছেন, সে সময়ে যদি কোন যাত্রী অভিযোগ করেন যে, তাঁর ঠাণ্ডা লেগে ফেনেনজাইটিস হবার উপক্রম হয়েছে, তাহলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে জানলা বন্ধ করতে বাধ্য। আর যখন কোন মহিলা যাত্রী অনেক টানাটানি করেও জানলা খুলতে বা বন্ধ করতে পারবেন না (যে ঘটনা আকছার হবে) তখন আপনাকে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বলতে হবে, মে আই হেল্প ইয়্যু ? এবং সম্মতির অপেক্ষা না করেই ঝটপট কাজ সেরে ফেলতে হবে।

বিলিতি ট্রেনে আর একটি কড়া নিয়ম আছে—সেটা ধূমপানের বেলা। মনে রাখতে হবে 'যদি দোশরা যাত্রী না চাহে তব্ বিড়ি-সিগারেট আদি না পিয়ে' অনুশাসনটি বিলেতের লোকেরাই একদিন কায়েম করেছিল। তাই অ-ধূমপায়ীদের জন্যে ওদেশে ট্রেনের কামরা আলাদা। 'লেডিজ ওনলি' কামরা বিলেতে নেই—কিন্তু নন-স্মোকার্স ওনলি কামরা আছে সে দেশে।

ধূমপান যাঁদের একদম সহ্য হয় না, যত্র ধূম তত্র বহ্নি, অর্থাৎ ধূম দেখলেই যাঁদের চোখে বহ্নি জ্বলে ওঠে, তাঁদের সংখ্যা বিলেতে কম

নয়। এঁরা যাতে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করতে পারেন, সে জন্যে সরকার এঁদের জন্যে বিশেষ কামরার ব্যবস্থা করেছেন। এই কামরায় যদি কেউ ধূমপান করেন, তাহলে একজন অ-ধূমপায়ী যাত্রী হিসাবে আপনার করণীয় কি? পাঁচ শিলিং দামের ট্র্যাভেলার্স পকেট-বুকে এ সম্পর্কে লেখা আছে, তখন আপনি নিজে অগ্নিমূর্তি ধারণ না করে সেই সাগ্নিক ব্যক্তিকে সবিনয়ে বলবেন, মহাশয় অথবা ভদ্রে, ধূমপানটি বন্ধ করলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে? কারণ এটি অ-ধূমপায়ীদের কামরা। ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যদি তাতে কর্ণপাত না করেন, তাহলে আপনি তৎক্ষণাৎ গার্ডকে গিয়ে ব্যাপারটি জানাতে পারেন। এই গার্ডকে জানাতে গিয়েই একবার নাকি অপ্রস্তুতে পড়েছিলেন বিলেতের খোদ পরিবহন-মন্ত্রী।

মন্ত্রীমশাই ভ্রমণ করছেন একটি প্রথম শ্রেণীর অ-ধূমপায়ীদের কামরায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন একজন যাত্রী মনের আনন্দে ধূমপান করছে। মন্ত্রীমশায় তো রেগে আগুন। তিনি যাত্রী ভদ্রলোককে ডেকে বললেন, মশায় শুনছেন, এ কামরাটি হল নন-স্মোকার্সদের। ধূমপায়ী কথার উত্তর না দিয়ে আর একটি সিগারেট ধরাল। রেল-মন্ত্রী তখন পকেট থেকে তাঁর ভিজিটিং কার্ডটা বার করে যাত্রীর দিকে ধরে বললেন, আমি কে বলছি বুঝতে পারছেন এবং আশা করি কি বলছি তাও বুঝতে পারছেন?

সহযাত্রী কোন কথা না বলে কার্ডটা তুলে নিলেন, তারপর পকেটে কার্ডটা রেখে দিয়ে সিগারেটে টান দিলেন।

স্টেশন আসতেই নেমে পড়লেন পরিবহন-মন্ত্রী। খুঁজে বার করলেন গার্ডকে। সাংঘাতিক ব্যাপার মশাই! অ-ধূমপায়ীদের কামরায় ধূমপান! আপনারা এর একটা বিহিত করবেন না?

গার্ড ছুটে গেলেন যাত্রীর কাছে। তিনি তখনও ধূমপান করছেন।

ও মশায় শুনছেন? এটি অ-ধূমপায়ীদের কামরা।

ভদ্রলোক কোন কথা না বলে পকেট থেকে কার্ডটি বার করে দিলেন গার্ডের হাতে। যে কার্ডটি তিনি কিছুক্ষণ আগে পরিবহন-মন্ত্রীর কাছ থেকে নিয়েছিলেন সেই কার্ডটি।

আসল পরিবহন-মন্ত্রী তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলছেন। গার্ডসাহেব কাঁপতে কাঁপতে তাঁর কাছে এসে বলল, স্যর, কিছু মনে করবেন না, যিনি ধূমপান করছেন, তিনি হলেন খোদ পরিবহন-মন্ত্রী। কিছু বলতে গেলেই আমার চাকরি একেবারে চলে যাবে।

॥ এগারো ॥

ট্রেভর বলল, আমার অ্যাম্বিশান হচ্ছে ফ্লিট স্ট্রীট। ট্রেভর আমার সাংবাদিক বন্ধু। কার্ডিফে ওয়েস্টার্ন মেল কাগজের জুনিয়ার রিপোর্টার। ট্রেভরের আরও অনেক সহকর্মী আছে। সকলেরই সেই এক কথা—ফ্লিট স্ট্রীট।

ফ্লিট স্ট্রীট হল বিলেতের খবরের কাগজের লোকেদের মক্কা। সমস্ত মুসলমানই যেমন পবিত্র মক্কা-তীর্থের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন, তেমনি বিলেতের সব খবরের কাগজওয়ালারাই ফ্লিট স্ট্রীটের দিকে তাকিয়ে আছেন। কথা হলে বলেন—কে, জন? ইয়র্কশায়ার পোস্টে যে ছিল তো? ফ্লিট স্ট্রীটে চান্স পেয়েছে? কি বললে, ডেইলি হেরাল্ড? তা হোক, তা হোক, তবু তো ফ্লিট স্ট্রীট। জানতাম ছোকরাটার উন্নতি হবে।

অনেকে আদর করে বলেন 'স্ট্রীট'।—কার কথা বলছেন, টমাস উইলসন? ও আগে তো বার্মিংহাম পোস্টে ছিল, এখন স্ট্রীটে আছে। তার মানে ফ্লিট স্ট্রীটে আছে।

কুইন্সওয়ে থেকে বাস যায় ফ্লিট স্ট্রীটে। লণ্ডনের বাসে মস্ত বড় সুবিধে যে বাসের গায়ে শুধু টার্মিনাসের নামই লেখা থাকে না, যে যে রাস্তা দিয়ে বাস যাবে, তার নামও লেখা থাকে।

পনেরো নম্বর বাস যাবে ফ্লিট স্ট্রীটে। অনেকখানি পথ—মার্বেল আর্চ, বণ্ড স্ট্রীট, প্যাডিংটন, পিকাডিলি, ট্রাফালগার স্কোয়ার, অল্ডউইচ হয়ে তারপরে ফ্লিট স্ট্রীট।

ভেবেছিলাম, এত বড় নাম-করা রাস্তা—না জানি কত বড় হবে! কিন্তু কণ্ডাক্টর যখন হাঁকল ফ্লিট স্ট্রীট, তখন তো নেমে তাজ্জব বনবার ব্যাপার। এরই নাম ফ্লিট স্ট্রীট! কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের

চেয়েও সরু রাস্তা। শুধু দুপাশে বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি। সূর্যের আলো প্রায় আড়াল হয়ে গেছে। এরই নাম সেই বিখ্যাত ফ্লিট স্ট্রীট।

আঁদ্রে বললে, হ্যাঁ, এই হল স্ট্রীট—দি স্ট্রীট অব অ্যাডভেঞ্চার। স্যার ফিলিপ গিব্‌স্‌ এই রাস্তাটাকে তাই বলতেন।

ফ্লিট স্ট্রীটে আঁদ্রেকে সবাই চেনে। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ডঃ তারাপদ বসু থেকে কমনওয়েল্‌থ্‌ প্রেস ইউনিয়নের লর্ড অস্টর পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, আঁদ্রে আমাকে গার্ডেন পার্টিতে জহরলাল নেহরুর সঙ্গে পর্যন্ত পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

আঁদ্রের কথা পরে বলব। আগে বলি ফ্লিট স্ট্রীটের কথা।

আঁদ্রে বলল, ফ্লিট স্ট্রীটের ঐতিহ্য হল তিন শতাব্দীর। আগে এখানে একটা নদী ছিল। নদীর নাম ফ্লিট। এই নদীর ধারেই বিলেতের প্রথম খবরের কাগজ ডেইলি কুরাণ্ট ও ফ্লিটের অফিস ছিল। সে ১৭০২ সালের কথা। ফ্লিট নদী আজ আর নেই, ফ্লিট কাগজও নেই। কিন্তু ফ্লিট স্ট্রীট আছে। আর বারোটি দৈনিক কাগজের অফিস এখন এই পাড়ায়।

বিলেত দেশটা হল খবরের কাগজ-পাগলা দেশ। খবরের কাগজ ওরা বাইবেলের মত করে পড়ে। ওদেশে যে জিনিস দামে সবচেয়ে সস্তা, তা হল খবরের কাগজ। মাত্র আড়াই পেনি দিলেই একটি মোটা খবরের কাগজ পাওয়া যায়। ওই পয়সায় আর কিছুই কিনতে পাওয়া যায় না।

সারা দেশ জুড়ে বহু দৈনিক খবরের কাগজ। মোট সংখ্যা একশো বারোর মত। আর বিভিন্ন কাগজের বিভিন্ন ধরন, বিভিন্ন মেজাজ। একটা ডেইলি মিরর কিনলে মনে হবে, গেল গেল, দুনিয়াটা বুঝি রসাতলে গেল। কিন্তু একটা টাইম কিনলে মনে হবে, না, তেমন কিছু হয়নি। বেকার স্ট্রীটে একটা আগুন লাগার খবর পড়ুন ডেইলি মেলে, মনে হবে এত বড় আগুনের পর লণ্ডন

শহরটা যে কি করে রক্ষে পেল সেটা এখন গবেষণার বিষয়। আবার ডেইলি টেলিগ্রাফ পড়লে মনে হবে—না, এমন কিছু বড় আগুন নয়। দমকলের লোকেরা যদি সময়মত না আসত তাহলে অবশ্য কি হত বলা যায় না।

লণ্ডনে কাগজ বাড়ি বাড়ি বয়ে দিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ নেই। রাস্তার মোড়ে স্টল। স্টল থেকে নগদ পয়সা দিয়ে কাগজ কিনুন। অফিস-যাত্রীদের সকলের হাতেই একটা করে কাগজ। টিউবে যেতে যেতে চোখের সামনে কাগজ ধরে সকলে গোগ্রাসে গিলছেন। বাইরে থেকে এক নজরে দেখলে মনে হবে বুঝি আর একটু পরেই পরীক্ষার ঘণ্টা পড়বে। তাই শেষ মুহূর্তে একবার উত্তরগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

বাসী কাগজ হাতে করে ঘোরা ভয়ঙ্কর গুণাহ্। কাগজ বাসী হয় কতক্ষণে? হাত দেওয়া মাত্রই তা বাসী। তাই টিউব-স্টেশন থেকে ওপরে ওঠবার সময় ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে সবাই কাগজগুলো ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

ফারুকির হাতে সব সময় দেখতাম একটি করে নতুন খবরের কাগজ। বণ্ড স্ট্রীটে হয়তো ফারুকির হাতে দেখলাম একটি ডেইলি টেলিগ্রাফ, টোটেনহাম কোর্ট রোডে আসতেই পিছন ফিরে হয়তো দেখলাম ফারুকির হাতে ডেইলি মেল কিংবা গার্ডিয়ান।

ফারুকি গম্ভীর হয়ে বলত, শুধু একটা কাগজ পড়লে চলে না। সমস্ত খবরের কাগজগুলো না পড়লে ওদের ভিউটা পাওয়া মুশকিল।

অবাক হয়ে বলতাম, এত সব কাগজ পয়সা দিয়ে কেন?

ফারুকি বলত, পাগল হয়েছ! কিনতে যাব কোন্ দুঃখে? স্টেশনের পেপার-বাস্কেট থেকে কুড়িয়ে নিই। তারপর পড়া হয়ে গেলে সেটি ফেলে আর একটা কাগজ তুলে নিই।

খবরের কাগজ হাত দেওয়া মাত্রই পুরনো হয়ে যাচ্ছে। সকালের

কাগজ রাতে বসে পড়া কোন ইংরেজ কল্পনাও করতে পারে না। তার জন্যে আছে ইভনিং পেপার বা সন্ধ্যাবেলার কাগজ।

বিলেতে প্রত্যেক বড় বড় শহর থেকেই একখানা দুখানা করে কাগজ বার হয়। এগুলো অধিকাংশই সান্ধ্য দৈনিক। সকালবেলা লোকে পড়ে লণ্ডনের কাগজ। এ কাগজগুলোর প্রচার সারা বিলেত জুড়ে। তাই এর নাম ন্যাশন্যাল ডেইলি। লণ্ডনের বাইরের কাগজগুলোর নাম প্রভিন্সিয়াল ডেইলি।

প্রভিন্সিয়াল ডেইলিতে থাকে প্রধানত সেই শহরের খবর। কোথায় একজিবিশন হল, কোথায় খুন-জখম হল, আগুন লাগল, কোন বড়মানুষের বউ হয়তো ডিভোর্স করল। সেই সব কাগজের প্রচার-সংখ্যাও নেহাত মন্দ নয়—ষাট-সত্তর হাজার থেকে দেড়লাখ।

তবে খবরের কাগজের খানদানী জায়গা হল ফ্লিট স্ট্রীট। কিন্তু বড় তাজ্জব কী বাত—খাশ ফ্লীট স্ট্রীটে মাত্তর দুটো দৈনিক খবরের কাগজের অফিস—ডেইলি টেলিগ্রাফ ও ডেইলি এক্সপ্রেস। তবে আর সব অফিসই হল কাছে-পিঠে। যেমন বোভারি স্ট্রীট থেকে বার হয় নিউজ অফ দি ওয়ার্ল্ড্ ও ডেইলি স্কেচ, টিউডর স্ট্রীট থেকে ডেইলি মেল, কারমেনাইট স্ট্রীটে ইভনিং নিউজ, ফেটার লেনে ডেইলি মিরর ও শুসেন থেকে বার হয় ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড। এছাড়া রয়টার ও প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরও ফ্লিট স্ট্রীটে। দেশ-বিদেশের অসংখ্য খবরের কাগজ ও এজেন্সীর দপ্তরও ফ্লিট স্ট্রীটের আনাচে-কানাচে।

ফ্লিট স্ট্রীটে এমন অনেক বাড়ি আছে, যেখানে দিনের বেলা সূর্যের আলো ঢোকে না। সেই সব বাড়িতে কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে অসংখ্য খোপ। খোপের গায়ে মুণ্ডমালার মত লেটার-বক্স সাজানো শুধু খবরের কাগজের নাম। মরিসাস টাইম্‌স্ থেকে সিলোন গ্রাফিক, মোম্বাসা হেরাল্ড থেকে জাকার্তা মেল। গোটা দুনিয়াটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ফ্লিট স্ট্রীটে।

ফ্লিট স্ট্রীটে একটা ভাঙা টাইপরাইটার অনেকের ভাগ্য ফিরিয়ে

দিতে পারে। দেশে থাকতে আখেরে কিছু সুবিধা হচ্ছে না। একটা টাইপরাইটার নিয়ে চলে এস ফ্লিট স্ট্রীটে। যে-কোন একটা খোপ ভাড়া নিয়ে দশ-বিশটা কাগজের বনে যাও লণ্ডন করেসপনডেণ্ট। হাতে শুধু একটা ধারালো কাঁচি রাখলেই চলবে। লণ্ডনের কাগজগুলো থেকে জুৎসই খবর কেটে সেই খবরই টাইপ করে পাঠাও বিভিন্ন কাগজে। আওয়ার লণ্ডন করেসপনডেণ্ট বলে তারা মহানন্দে সে খবর ছাপবে।

আঁদ্রে একদিন ফ্লিট স্ট্রীটে একটা টাইপরাইটার নিয়ে এমনভাবেই জীবিকা শুরু করেছিল। আজ সে চার-পাঁচটি কাগজের লণ্ডন প্রতিনিধি। আঁদ্রে খাঁটি সাহেব। কিন্তু ভারতবর্ষে ওর জন্ম ও শৈশব কেটেছে বলে ভারতের ওপর ওর খুব টান। এককালে ইণ্ডিয়া লীগের একজন হোমরাচোমরা ছিল।

আঁদ্রে বলল, ফ্লিট স্ট্রীটের ঐতিহ্য যে শুধু খবরের কাগজের একথা মনে করলে ভুল করবে। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গেও ফ্লিট স্ট্রীটের নাম অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে। এই ফ্লিট স্ট্রীট ও স্ট্র্যাণ্ডের সংযোগস্থলে টেম্পল বার-এর কাছে রয়েল প্রিণ্টার রিচার্ড পাইনসনের দপ্তর থেকে চসারের কালজয়ী সাহিত্যকর্মগুলি প্রথম প্রচারিত হয় সমগ্র বিশ্বে। ক্যাক্স্টল যিনি ব্রিটেনে প্রথম মুদ্রণ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, তাঁর উত্তরাধিকারী উইল্কিন-ডি-ওয়ার্ডের বসবাস ছিল ফ্লিট স্ট্রীটের সান ট্যাভার্নে।

ফ্লিট স্ট্রীটের অপর প্রান্ত লাডগেট হিলের কাছে সেণ্ট্ পল্স্ গীর্জার প্রাঙ্গণ থেকে প্রকাশিত হয় শেক্সপীয়রের অনেকগুলি নাটকের প্রথম সংস্করণ। ফ্লিট স্ট্রীটের পাশে গাফ স্কোয়ারের বাড়িতে বসে অভিধান সঙ্কলন করেছিলেন সামুয়েল জনসন। তাঁর বাড়িতে আড্ডা জমত কবি গোল্ড্স্মিথ,দার্শনিক গিবন ও স্যার যোশুয়া রেনল্ড্স্-এর। পূর্বদিকের এক বাড়িতে বাস করতেন বায়রন, সেখানেই এখন রয়টারের হেড কোয়ার্টার্স।

ফ্লিট স্ট্রীটে দৈনিক যে খবর ছাপা হচ্ছে, তা অনেকের কাছেই বোম্‌শেল। কিন্তু ফ্লিট স্ট্রীটে খবরের কাগজের অফিসগুলোর ওপর গুরুতর ভাবে বোমা পড়েছিল গত মহাযুদ্ধের সময়। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড ও ডেইলি হেরাল্ডের অফিসের ওপর প্রথম বোমা পড়ল। এর পরে বোমা পড়ল টাইম কাগজের ওপর। ডেইলি স্কেচের একজন ফটোগ্রাফার ডার্করুমে কাজ করছিল, সে বেচারা মারা পড়ল। ২৯শে ডিসেম্বর আবার বোমা পড়ল ফ্লীট স্ট্রীটে। স্ট্রীটের মস্তবড় গীর্জা সেণ্ট ব্রাইড্‌স্‌ চার্চ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ডেইলি টেলিগ্রাফ অফিসেরও বেশ কিছু ক্ষতি হল। এরপরে আরও বেশ কয়েকবার ছোটখাট বোমা পড়েছে ফ্লিট স্ট্রীটে।

খবরের কাগজের অফিস ছাড়াও আরও এক ধরনের অফিস আছে ফ্লিট স্ট্রীটে। সেগুলো হল লিটারারি এজেণ্টদের অফিস। এঁদের কাজ হল পত্র পত্রিকায় লেখা কেনা-বেচা করা।

বিলেতে কোন কিছুই এজেণ্ট ছাড়া হওয়ার উপায় নেই। কোন ফিল্মস্টারকে কোন ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ করতে হবে, যান তার এজেণ্টের কাছে; কোন শিল্পীকে গান গাইবার জন্য নেমন্তন্ন করবেন, শিল্পী বলবেনঃ আমার এজেণ্টদের সঙ্গে কথা বলুন। সাহিত্যের ব্যাপারেও তেমনি এই এজেণ্ট। এঁরা বড় বড় লেখকদের কাছ থেকে লেখা এনে মজুদ করে রাখেন, তারপর দর বুঝে ঝাড়েন। নতুন লেখকদের কাছ থেকেও এঁরা লেখা নেন, এবং সেগুলো জায়গামত গছাবার চেষ্টা করেন।

এই সব এজেণ্টরা প্রায়ই কাগজে বিজ্ঞাপন দেনঃ চুপচাপ বসে আছেন কেন, লিখে টু পাইস রোজগার করুন না! এঁরা আবার হবু লেখকদের কি ভাবে লিখতে হয়, সে সম্বন্ধে লেসন্‌ দেন। বলা বাহুল্য, টু-পাইসের বিনিময়ে। এঁদের বিজ্ঞাপন দেখে অনেক সময় সেই বাংলা বিজ্ঞাপনটা মনে পড়ে—তোতলাচ্ছেন কেন? অনর্গল কথা

বলুন। এঁদের বিজ্ঞাপনও তেমনি। চুপচাপ বসে কেন? লিখে টু-পাইস রোজগার করুন।

লণ্ডনের এই লিটারারি এজেন্টদের সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। একবার একজন সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী লেখক একটি লেখা পাঠিয়েছিলেন এক এজেন্টের কাছে। সেই সঙ্গে একখানা চিঠিঃ মহাশয়, এই লেখাটি প্রকাশ করিবার পক্ষে কোন্‌টি 'বেস্ট চ্যানেল' হইবে তাহা যদি দয়া করিয়া বাতলান তো বড় ভাল হয়।

শোনা যায়, এজেন্ট নাকি উত্তর দিয়েছিলেনঃ আপনার লেখার উপযোগী একটিমাত্র চ্যানেলই মনে পড়িতেছে, তাহা হইল 'ইংলিশ চ্যানেল'।

আর একবার এজেন্টের কাছে একজন এক কবিতার খাতা নিয়ে এসে হাজির: আজ্ঞে স্যর, যদি দয়া করে কবিতাগুলো একটু দেখেন চলবে কি না।

কবিতাগুলো পড়ে তো এজেন্টের চোখ ট্যারা! তিনি একটু ঘাবড়ে গিয়েই কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ মশাই, এসব কবিতা আপনি নিজে লিখেছেন?

লোকটি বুক ফুলিয়ে জবাব দিল, তা নয় তো কি মশায়?

এজেন্ট একটু অপ্রস্তুত হওয়ার ভান করে বললে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় আনন্দ হল মিঃ শেলী। আমার ধারণা ছিল, অনেকদিন আগে জলে ডুবে আপনার মৃত্যু হয়েছে।

আঁদ্রে বলত, দেখ, ইংরেজীতে একটা কথা আছে—মানুষকে চেনা যায়, সে যাদের সঙ্গে মিশছে তাদের দিয়ে। এ ম্যান ইজ নোন বাই কম্পানি হি কিপ্‌স্‌। ইংরেজদের চেনা যায় কোন্‌ খবরের কাগজ সে পড়ছে, তা দিয়ে। যেমন ধর, যে ডেইলি মিরর পড়ছে, সে সিরিয়াস পড়াশুনোর ধার ধারে না। পান ভোজন আর ফুর্তি নিয়েই তার সারা দিন কেটে যায়। ডেইলি এক্সপ্রেস আর ডেইলি মেল যারা পড়ে, তারা একটুখানি উন্নত। এরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বই

পড়ার অভ্যেস আছে, তবে সেগুলো নাটক-নভেল। এরা রাজনীতির খুব যে একটা কিছু বোঝে তা না, তবে অবসর পেলেই তা নিয়ে আলোচনা করে।

ডেইলি টেলিগ্রাফ যারা পড়ে, তারা বেশ সিরিয়াস ধরনের। তবে মতবাদের দিক থেকে তারা কনজারভেটিভ। গার্ডিয়ান যিনি পড়েন, বুঝতে হবে তিনি গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে চান না। তাঁর নিজস্ব একটি ভাবনা আছে। সবচেয়ে খানদানী লোকেরা হলেন টাইম্‌স্ পড়নেওয়ালারা। টাইম্‌সের যেমন নীরস লেখা, কটমট ইংরেজী—তাতে করে যাঁরা পড়েন, বোঝা যায় তাঁরা বেশ বড় লোক, কড়া পাইপ টানেন। কম কথা বলেন। সমাজে তাঁদের অনেকের পরিচয় ইনটেলেকচ্যুয়াল বলে।

ফারুকি ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট থেকেই টাইম্‌স কাগজ তুলত না। জিজ্ঞাসা করলে বলত, একটা টাইমস্ পড়তে গেলে একশিশি ওডিকোলেন লাগবে। বিলেতে টাইম্‌স্ যাঁরা পড়েন, তাঁরা খুব ইজ্জত পান। আর পয়লা নম্বর কাগজ বলে টাইম্‌সের খুব খ্যাতি। কোন বিষয় সম্পর্কে টাইম্‌স্ কি বলল, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

টাইম্‌সের প্রচার-সংখ্যাও কম। অতি সীমিত গণ্ডীর মধ্যে তার প্রচার। এতে টাইম্‌সের মর্যাদা কমেনি বরং বেড়েছে। কর্তৃপক্ষ বলেন, দেখ, আমাদেব কাগজ এদেশে বাছাই-করা লোকদের জন্যে, সাধারণ লোকেদের জন্যে নয়।

বিলেতে রবিবারে খবরের কাগজ বার হয় না। সপ্তাহে একদিন করে দৈনিক কাগজের প্রকাশ বন্ধ। রবিবার হল বিলেতে বন্ধের দিন। সিনেমা বন্ধ, পাব্ বন্ধ, খবরের কাগজ বন্ধ, দোকান-পাট বন্ধ। রবিবার মানে গোটা বিলেত মরুভূমি।

রবিবার হলে প্রফুল্লবাবুকে দেখতাম দুপুর নাগাত রবিবারের কাগজগুলো কিনতে যেতেন। কয়েকটি কাগজ বার হয় রবিবারে।

সেগুলোকে বলে 'সানডে পেপার'। প্রতি রবিবার এই কাগজগুলি প্রকাশিত হয়। রবিবারে ওই কাগজের স্টলে লোক থাকত না। শুধু একটা কৌটা থাকতো। খদ্দেররা যে যার দাম ওই কৌটাতে ফেলে দিয়ে কাগজ নিয়ে নিত।

বিলেত দেশটা মাটির। ওদেশে চুরি-জোচ্চুরি হয় না, দেশের লোক সবাই খ্রীষ্ট অথবা বুদ্ধ একথা মনে করলে ভুল হবে। তবে অনেস্টি সম্পর্কে ওদের একটা যুগ যুগ ধরে ধারণা জন্মে গেছে। যেমন খবরের কাগজ দাম না দিয়ে নিতে নেই—এ রকম একটা সংস্কার হয়ে গেছে। রোজ সকালে দুধওয়ালা বাড়ির বাইরে ভর্তি দুধের বোতল রেখে যায়। ও রকম ভাবে মদের বোতল বাইরে থাকলে কি হত তা বলা যায় না। তবে এই দুধ চুরি হয়ে গেছে, কাগজের দোকানের হিসেবের গরমিল হয়েছে, অথবা সিগারেটের বাক্স ভেঙে সিগারেট চুরি হয়ে গেছে—এ ঘটনা যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না তা নয়। তবে এসব ঘটনা কমই ঘটে।

টমসন স্কুল অব জার্নালিজমের আমার সাংবাদিকতার মাস্টারমশাই আমাকে বলতেন—বিলেতের খবরের কাগজগুলোর লেখার বিষয় প্রধানতঃ তিনটি—অর্থ, খাদ্য ও নারী। বিশেষ করে মহিলারা হলেন খবরের কাগজের একটা প্রধান সাবজেক্ট। খবরের কাগজ খুললেই পাতায় পাতায় শুধু মেয়েদের ছবি। কোন্ ধনী মহিলা এই তৃতীয়বার ইলোপ করলেন, কোন্ ইংরেজ তরুণী কোন্ রাশিয়ান যুবকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, কোন্ তরুণী একলাই পৃথিবী-ভ্রমণে বার হচ্ছেন। ডেইলি টেলিগ্রাফে দেখতাম, প্রথম পাতায় রোজ একটা করে সুন্দরী তরুণীর ছবি থাকত। তলায় ক্যাপশন—আজ ইনি লণ্ডনের সবচেয়ে সুন্দরী কন্যা। একজন ফটোগ্রাফারের চাকরিই ছিল রোজ সকালে ক্যামেরা হাতে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে ও সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ছবি তুলতে হবে। তারপর ছবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছবিটি ছাপা হবে।

খবরের কাগজের সাবজেক্ট মহিলা হলেও মহিলারা সবাই খবরের কাগজ পড়েন—একথা মনে করা ভুল। আমি অনেক মহিলাকে দেখেছি যাঁদের খবরের কাগজ একদম সহ্য হয় না। তবে আমি খবরের কাগজ সম্পর্কে একজন উৎসাহী মহিলার সন্ধান পেয়েছিলাম। মহিলাটি একটি কাগজের দীর্ঘদিন পাঠিকা ছিলেন। কাগজটি তাঁর ভাল লাগত।

একদিন কাগজের ছাপাখানার কর্মচারীরা ধর্মঘট করে বসল। ধর্মঘট চলল বিশদিন ধরে। মহিলাটি আর কাগজ পড়তে পান না। তিনি একদিন ব্যাকুলকণ্ঠে ফোন করলেন সম্পাদককে :

—আপনি কি মিঃ সম্পাদক বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সম্পাদক উত্তর দিলেন।

—আপনাদের কাগজ আর বার হচ্ছে না কেন?

—কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছে। যতদিন না ধর্মঘট মেটে, ততদিন বন্ধ থাকবে কাগজ।

এবার মহিলাটি যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন তা মশাই ধর্মঘট যে চলবে তা তো আগে থেকেই জানতেন। তখন যদি বিশ-দিনের কাগজ একসঙ্গে ছাপিয়ে রাখতেন তাহলে আর এত ঝামেলা পোহাতে হত না।

॥ বারো ॥

ফারুকি আমায় অনেকদিন ধরে তাতাচ্ছিল ঃ ইয়ার, বিশ পাউণ্ড দিয়ে একটা বেশ জেল্লাদার ডিনার স্যুট বানিয়ে ফেল। হাইড পার্কে রোজ কেরোসিন কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতে করে যে কালো আর মোটা জ্যামিক্যান ছেলেটি, ওর স্যুটের কি চেক্‌নাই দেখেছ ? আর তুমি একজন জার্নালিস্ট, লাট-বেলাটের সঙ্গে এক টেবিলে খানাপিনা কর, তোমার একটা জেল্লাদার স্যুটই নেই।

এই বলে ফারুকি তার নতুন বানানো ডাবল-ব্রেস্ট জ্যাকেটের নীচেটা একটু টেনে ঠিক করে দিল।

তা ঠিকই তো, অতদূর হাইড পার্কে যেতে হবে কেন, আমার সামনেই মহম্মদ ওমর ফারুকি বিশ পাউণ্ডের এক ডিনার স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন। চল্লিশ বছরের ফারুকিকে চব্বিশ বছরের কেমব্রিজের কোন জোয়ান ছাত্র বলে মনে হচ্ছে। আর তার পাশে আমি ? চাঁদনি থেকে বেজি রঙের একশো টাকা দামের একটা ঢলঢলে ট্রপিক্যাল স্যুট পরে ক্যাবলার মত দাঁড়িয়ে আছি। ফারুকির পাশে আমাকে মনে হচ্ছে যেন হাউস অব লর্ডস-এর মেম্বারের পাশে হাউস অব কমন্স-এর একজন ব্যাক-বেঞ্চার।

ফারুকিকে বললাম ঃ কিন্তু বিশ পাউণ্ড কোথায় পাই কও তো ? সবে এসেছি লণ্ডনে, স্যুট করতেই যদি তিনশো টাকা খসাতে হয় তাহলে খাব কি ?

ফারুকি বলল ঃ আহা, তোমায় একবারে দিতে হবে না। শনৈঃ শনৈঃ দেবে। পেয়েব্‌ল্—হোয়েন এবল্‌।

বললাম ঃ কও কি ? তাও আবার হয় নাকি ?

ফারুকি অনেকটা ঠিক সেইরকম ভাবে বলল: 'অয় অয়, zানতি পার না।'

তা সত্যিই ব্যাপারটা জানা ছিল না। ফারুকির সঙ্গে স্ট্র্যাণ্ডের 'উইভার টু ওয়্যারার' টেলারিং শপে যেতেই মিঃ টেলর (দর্জি এই অর্থে) এক হাত জিভ কাটলেন। ছিঃ ছিঃ, আপনাকে এখুনি কে দাম দিতে বলছে স্যার? আমাদের এত পর পর ভাবছেন কেন? আজ ধারে নিয়ে যান—কাল নগদ দিয়ে শোধ করে দেবেন। আগে আমাদের স্যুট অঙ্গে ওঠান। পাঁচ-দশ জনকে ঘুরে ঘুরে দেখান। আপনার গার্ল ফ্রেণ্ডের কি রিয়্যাক্‌শন লক্ষ্য করুন। তারপরে প্রতি হপ্তায় হপ্তায় এক পাউণ্ড করে দিয়ে শোধ করে দেবেন।

একটিমাত্র চুক্তিপত্রে সই দিতেই বিশ পাউণ্ডের স্যুট হাতে এসে গেল। তখন আমিই বা কে আর ডিউক অব এডিনবরাই বা কে।

আমাদের দেশেই চার্বাক ঋণ করে ঘি খেতে বলেছিলেন। অথচ আমাদের দেশের সমস্ত দোকানে এই কথাটা টাঙানো—'আজ নগদ কাল ধার।' কিন্তু সারা বিলেত দেশ জুড়ে দোকানে দোকানে অলিখিত বাণী—'আজ ধার: কাল নগদ।'

এরই নাম 'হায়ার পারচেজ'। সংক্ষেপে এইচ-পি।

এখন বিলেতে এই যে হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, মধ্যবিত্ত লোকের পরনে দামী দামী বাহারে স্যুট, রাস্তায় রাস্তায় এত মোটর, বাড়িতে এত সোফা-সেট, ওয়াশিং মেশিন, টেলিভিসন--তা নাকি সবই এক ভদ্রলোকের কল্যাণে—তার নাম মিঃ এইচ-পি। সারা ব্রিটেনের লোকের এখন কত টাকা ব্যক্তিগত ধার জানেন? ৮৮ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। 'মাথাপিছু প্রত্যেকটি লোকের দেনার হিসেব করলে পড়বে ১৮ পাউণ্ড করে।

আগে শুধু বিলেতে এইচ-পি'তে সিঙ্গার মেশিন পাওয়া যেত। তারপর পিয়ানো। এর পর এল রেডিও সেট। এখন এমন কোন জিনিস নেই যে ধারে হয় না।

হায়ার পারচেজের জিনিসপত্রের ওপর শতকরা পাঁচ টাকা সুদ দিতে হয়। যাঁদের রেস্ত একটু বেশি, তাঁরা অবশ্যই কিস্তিবন্দীতে জিনিস কিনতে চাইবেন না। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে এ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। সাধারণত যাঁদের আয় বছরে পাঁচশো থেকে এক হাজার পাউণ্ডের মধ্যে, তাঁরাই হলেন এইচ-পি'র আসল খদ্দের। এঁরা বেশির ভাগ বিবাহিত এবং বয়স বাইশ থেকে চল্লিশ বছর।

এই বয়সের কথাটা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রফুল্লবাবুকে।

প্রফুল্লবাবু বললেন: বাইশ বছর বয়স থেকে ছেলেরা ঘর বাঁধতে শুরু করে। তাই ঘর সাজাবার জন্যে ধার করা শুরু হয় এই বয়স থেকেই। আর চল্লিশের পর ধার করা বন্ধ হয়, কারণ ধার শোধ দেবার মত যথেষ্ট সময় চাই তো। আর, একটু উড়ু-উড়ু মন, একটু ফূর্তি করার মত মেজাজ কম বয়সেই থাকে। কাজেই অত ঘি খাবার মত যখন টাকা নেই, তখন অগত্যা ঋণং কৃত্বা—।

পারচেজ কখন হায়ার হবে সে সম্পর্কে নানা বিধান আছে। সব পারচেজই হায়ার পারচেজ নয়। হায়ার পারচেজে আপনি জিনিসের মালিক হবেন না। প্রথমে ভাড়া গুণে যান। তারপর সুদে-আসলে মিলিয়ে যখন দাম উঠে আসবে, তখনই জিনিস আপনার।

আর এক রকমের পারচেজ আছে। এতে প্রথম থেকেই আপনি জিনিসের মালিক। তারপর কিস্তিতে টাকা শোধ করুন।

আমার ল্যাণ্ডলেডি মিসেস কিমিনিস্কি বললেন: যুদ্ধের সময় তো দেখ নি! কী দিন যে গেছে বাছা! টি-ভি তো দূরে থাক, একদিন ভাল ডিনারের মুখ পর্যন্ত দেখি নি।

অথচ এখন কিমিনিস্কির দোতলা বাড়ি। প্রতি ঘরে দামী কার্পেট, দামী খাট। ধবধবে বিছানা। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, টেলিভিসন, রেডিও, ওয়াশিং মেশিন। অথচ মিঃ কিমিনিস্কি কারখানায় কাজ করেন, মাসে শ' পাঁচেক টাকা মাইনে পান।

ব্রিটেনের লোকের মত মিসেস কিমিনিস্কিও বলেন: সব বাছা এক

ভদ্রলোকের কল্যাণে। নাম তাঁর মিঃ এইচ-পি। তা এইচ-পি'তে হেন জিনিস নেই যা হবে না। বিয়ে করতে চান? তাও এইচ-পি'তে হবে।

ফারুকি খ্যাক খ্যাক করে হাসছিল।

প্রফুল্লবাবু ওকে থামিয়ে দিলেন। হাসছেন কেন মশায়? আমি কি আপনাকে তাপ্পি দিচ্ছি? আমার অন্তত চারজন বন্ধু এইচ-পি'তে বিয়ে করেছে। বলি, বিয়ের আর খরচ কি? নমো-নমো করে পাঁচ পাউণ্ডে বিয়ে নামিয়ে দেওয়া যায়। আসল খরচ হল ডিনারের। তা, হোটেলওয়ালাদের বললে ওরা এসে শ'খানেকের মত প্লেট সাজিয়ে দিয়ে যাবে। যা খরচা হবে, তা আস্তে আস্তে শোধ করুন।

প্রফুল্লবাবু নিজে বিয়ে করেন নি, তবে তিনি নিজে হায়ার পারচেজে অনেক ডিপ্লোমা নিয়েছেন।

বিলেতের বিভিন্ন সান্ধ্য-ক্লাসে এই ডিপ্লোমা কোর্সের এক থাওকা দর আছে। যেমন 'শূকর-পালন পদ্ধতি' সম্পর্কে যদি আপনি একটি ডিপ্লোমা নিতে চান, তাহলে আপনাকে দিতে হবে দশ পাউণ্ড। এক বছর ধরে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় তুঘণ্টা ধরে লেকচার হবে। দশ পাউণ্ড আপনাকে একেবারে দিতে হবে না। পাঁচটি সহজ কিস্তিতে পরিশোধ্য।

আমাদের এ দেশে ঋণী অর্থে মহাপাপী ব্যক্তি। মহাভারতে যে ছ'জন সুখী লোকের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে একজন হলেন অ-ঋণী। কিন্তু খোদ বিলেতে ঋণী ব্যক্তিও স্বর্গে যান এবং যান ঋণ করেই। সে-দেশে হায়ার পারচেজে দান-ধ্যানও করা যায়।

হায়ার পারচেজ ব্যবস্থার ফলে বিলেতের অর্থনীতি এখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। সব দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার ফলে এসিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটেনের বাজার এখন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ওঁরা তাই মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। এত রেডিও, টেলিভিসন, রেফ্রিজারেটর, মোটরগাড়ি, কোথায় বেচা যায়? ওঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, দেশের

মধ্যেই খদ্দের খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু লোকের হাতে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে উদ্বৃত্ত টাকা আর কতটুকু থাকে? তাই আবির্ভাব হয়েছে মিঃ এইচ-পি'র। ফেল কড়ি মাখ তেল নয়—আগে খেয়ে পরে দাম।

মিসেস কিমিনিস্কি বললেন: হায়ার পারচেজেরও ভাল ও মন্দ দুটো দিকই আছে বাছা। ভাল দিকটা হল: এইচ-পি না হলে আমরা কখনই এ সব ভাল ভাল জিনিসের মুখ দেখতাম না। আর জিনিসও একেবারে ভাল পাওয়া যায়। ধারের টাকা শোধ হতে অনেকদিন লাগে। কাজেই জিনিসটা বেশি টেঁকসই হয়। কারণ তা না হলে কেউ ট্যাঁক থেকে টাকা খসাতে চাইবেন না। তড়িঘড়ি করে বাজে মাল গছিয়ে দেবার তাই কোন সম্ভাবনা থাকে না।

তবে ওই এক মুশকিল। শেষ পর্যন্ত এক নেশা হয়ে দাঁড়ায়। আরও জিনিস কিনব। আরও ঘর সাজাব। এই নিয়ে চলে পাঁচ-গেরস্তর মধ্যে প্রতিযোগিতা। জনসন-গিন্নী দোকানে যেতেই শুনতে পান, তাঁর পাশের বাড়ির ডাটন-পত্নী একটি ওয়াশিং মেশিন কিনে ফেলেছেন। এতদিন বাকেটে গুঁড়ো সাবান দিয়ে কাপড় কাচতে কোন অসুবিধাই হচ্ছিল না, কিন্তু ডাটন-গিন্নী—

দোকানী বলে: কেন চিন্তা করছেন মাদাম? বেশি চিন্তা করলে হার্টের রোগ হয়। ভাল খিদে হয় না। তার চেয়ে আপনিও একটা নিয়ে যান। হপ্তায় দু-পাউণ্ড করে শোধ করবেন। একসঙ্গে তো আর দিতে হচ্ছে না।

অতএব ভ্যানে করে ওয়াশিং মেশিন এসে পৌঁছয় মিসেস জনসনের বাড়িতে। তাঁর স্বামী আবার ক-মাস আগে অফিসে যেতে অসুবিধা হয় বলে একটা গাড়ি কিনে ফেলেছেন। এখন কেনবার সময় ঝোঁকের মাথায় কেনেন, কিন্তু মুশকিল হয় ধার শোধ দেবার বেলা।

হায়ার পারচেজের চুক্তিপত্র একেবারে ভয়ংকর জিনিস। খুদে

খুদে অক্ষরে আইনের কত রকম ধারা উপধারা যে সেখানে লেখা, তার ইয়ত্তা নেই। কে অত পড়ে দেখে? সই করার কথা, সই করে দেয় সকলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুক্তিমত টাকা না দেবার জন্যে কারুর কপালে জোটে কারাবাস, কারুর বাড়ি থেকে কোম্পানির লোকজন এসে জিনিসপত্র টেনে নিয়ে যায়। নয় তো কিস্তির ধার শোধ করার জন্যে কর্তা-গিন্নী দুজনকেই ওভারটাইম খাটতে হয়।

সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন : তা হোক। তবু এইচ-পি ব্রিটেনের সমাজ-জীবনের অনেক উপকার করেছে। সে মানুষকে ঘরমুখো করেছে। গৃহসজ্জা, আরামের উপকরণ আছে বলেই গৃহ এত মনোরম। ঘর মানুষকে আকর্ষণ করে এই কারণে যে, সেখানে গেলে নরম সোফায় বসে সে টেলিভিসন দেখতে পারবে। সেখানে সুদৃশ্য ডাইনিং টেবিলে স্ত্রীর হাতে ডিনার খেতে খেতে সে রেডিও শুনতে পারবে। এই স্বাচ্ছন্দ্য, এই বিলাস এসেছে এইচ-পি'র কল্যাণে। তাই বিলেতের মানুষ এত ঘর ভালবাসে, হোম তার কাছে তাই 'সুইট হোম'।

হায়ার পারচেজে আজ বিলেতে বাড়ি বিক্রি হচ্ছে। সরকারী বাড়ি নয়। বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি প্রাইভেট বাড়ি। বিলেতে পুরো নগদ দাম দিয়ে বাড়ি করার কথা চিন্তা করেন কেবলমাত্র ধনীরা। অধিকাংশ বাড়ি বিক্রি হয় হায়ার পারচেজে। খবরের কাগজে সে সব বাড়ির ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

বিলেতে এখন সংসার পাততে গেলে নগদ টাকার কোন দরকার নেই। শুধ্ একটা বাঁধা আয় থাকলেই হল। তারপর দেখতে দেখতে আপনি বাড়-বাড়ন্ত হয়ে উঠবেন। আপনার বিবাহ থেকে আরম্ভ করে বাড়ি, গাড়ি, বিছানা আসবাবপত্র সবই হবে মিঃ এইচ পি সাহেবের কল্যাণে। এমনকি ছুটিতে কন্টিনেন্টে ট্যুর করার খরচাটাও দেবেন মিঃ এইচ-পি।

হ্যাঁ, শুনে ঘাবড়াবার কিছু নেই। আগে খেয়ে পরে দাম

দেবার মত আগে ঘুরে পরে দাম। বিভিন্ন এয়ার কোম্পানি ও জাহাজ কোম্পানি আপনাকে লুফে নেবে। তারা আপনাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে যে-কোন দ্রষ্টব্য স্থান। পরে ফিরে এসে ধীরে ধীরে তাদের প্রাপ্য টাকা শোধ করবেন। এর নাম ট্র্যাভেল ফার্স্ট পে লেটার (আগে ঘুরে পরে দাম) স্কীম।

এ সম্পর্কে এক হাড়-কিপ্‌টে জাহাজ কোম্পানির গল্প মনে পড়ল। এই জাহাজ কোম্পানিটির কাছে যাত্রীরা বহুবার 'ট্র্যাভেল ফার্স্ট পে লেটার' পরিকল্পনা চালু করতে বলেছে। কিন্তু কোম্পানি রাজী হয় নি।

একবার মাঝ-দরিয়ায় তুফান উঠল। জাহাজ ডুবুডুবু। ক্যাপ্টেন লাইফবেল্ট নামালেন জলে। তারপর ডেকের অসহায় যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ বন্ধুগণ, আপনাদের মধ্যে যাঁরা শিশু ও স্ত্রীলোক তাঁরা সবচেয়ে আগে আসবেন। এই সর্বপ্রথম আমাদের কোম্পানি 'ট্র্যাভেল ফার্স্ট পে লেটার' পরিকল্পনা চালু করল।

॥ তেরো ॥

রোজই দেখি বাকিংহাম প্যালেসের সামনে বহু লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে একটু কমদামী পোশাক, হাতে চামড়ার ছোট স্যুটকেস, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। একনজর দেখলেই বোঝা যায় এরা বিলেতের দেহাতী মানুষ। গাঁ থেকে রাজধানী দেখতে এসেছে।

এরা সারাদিন লণ্ডন ঘুরবে, পার্লামেণ্ট দেখবে, টাওয়ার অব লণ্ডন দেখবে, সময় পেলে আরও দূরে যাবে উইণ্ডসর ক্যাসেল দেখতে, তারপর রিজেট পার্কে বসে নাস্তা করবে, একটু গড়িয়ে নিয়ে সন্ধ্যের ট্রেন ধরবে।

লণ্ডন যা দেখার তা ওরাই দেখে। ওরা মানে গাঁয়ের লোকরা আর ট্যুরিস্টরা। লণ্ডনের লোককে লণ্ডনের কথা জিজ্ঞাসা করলেই বলবে : তা, আমার অত সময় কোথায় বাপু যে লণ্ডন দেখব ? বলে, ছুনিয়ার কত দেখার জিনিসই দেখতে পারলাম না। তা, লণ্ডন শহরটা কি পালিয়ে যাচ্ছে ?

তা সত্যিই তো লণ্ডন দেখার সময় কোথায় লণ্ডনের লোকের ? সকাল হতে না হতেই অফিস। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। এক হল উইক-এণ্ডগুলো। তা, ঐ দিন ইচ্ছে করে একটু নৌকো-বিহার করি হাইড পার্কে গিয়ে অথবা আর একটু দূরে চলে যাই—কেণ্ট অথবা এসেক্সে। একটা নিরিবিলি ঝোপ-ঝাড়ের পাশে তৃণশয্যায় শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিই। পাশে বান্ধবী কিংবা নবপরিণীতা স্ত্রী। বছরে একমাস ছুটি, তা সেই ছুটিতে যদি লণ্ডনের বাইরে না গেলাম তাহলে গলায় দড়ি। কন্টিনেন্ট হলে সোনায় সোহাগা আর তা না হলে নিদেনপক্ষে না হয় স্কটল্যাণ্ড অথবা নর্থ ওয়েল্‌স্‌।

তাই লণ্ডনের সব কিছু দেখার সময় নেই লণ্ডনবাসীর।

মিসেস ফ্রিগাড আমাদের কমনওয়েল্‌থ প্রেস ইউনিয়নের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি। ওঁর বাড়িতে গিয়ে আলাপ হল, মিঃ ফ্রিগাডের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বেশ বয়স হয়েছে। খুব রসিক। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম : টাওয়ার অব লণ্ডন দেখেছেন ?

: দেখেছি, তবে দূর থেকে। যাতায়াতের পথে দূর থেকে যতটুকু দেখা যায়। ভেতরে যাবার মত সময় কোথায় মশাই ?

: আর চিড়িয়াখানা ?

লণ্ডন জু পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম জু। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে হতাশ করলেন।

: সেই ছোটবেলায় গিয়েছিলাম একবার। ওসব মশায় ট্যুরিস্টদের জন্যে, দেহাতী লোকদের জন্যে।

মিঃ ফ্রিগাড জানালেন : তবে বাকিংহাম প্যালেসের ভেতর একবার ছোটবেলায় গিয়েছিলাম। সেই নয়ন সার্থক হয়েছে। আমার খুড়োমশাই কাজ করতেন প্যালেসে। খুব বড় অফিসার। আমাকে একবার নিয়ে গিয়েছিলেন। নয়তো প্যালেসের ভেতর ঢোকা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রাসাদ তো নয় একটা পুরো শহর। কত ঘর আছে জানেন ? ছ'শো। সারা প্রাসাদে যত কার্পেট পাতা আছে তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন মাইল। একবার তো কুইন মেরী প্রাসাদের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিলেন। তিন ঘণ্টা চেষ্টা করার পর তবে তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আর একবার আরও মজা হয়েছিল। এক ছুতোর-মিস্ত্রী কাজ করছিল প্রাসাদের ভেতর। কাজ করতে করতে তার যন্ত্রপাতির বাক্সটা কোন্ ঘরে সে রেখেছে আর মনে করতে পারছে না। খোঁজ খোঁজ। কিন্তু বাকিংহাম প্যালেসে ঘর খুঁজে বার করা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে কঠিন। দু'শো বছর পরে

বাকিংহাম প্যালেস যখন মেরামত হচ্ছে, তখন সেই বাক্সটি পাওয়া গেল।

প্রাসাদের যে ঘরে রাজসিংহাসন সেই ঘরটি পঁয়ষট্টি ফুট লম্বা আর ঘরটি সোনায় মোড়া। প্রাসাদের যেটি ড্রইং-রুম সেটি আরও লম্বা—আটষট্টি ফুট। প্রাসাদের একটি ঘর হল হাসপাতাল ঘর। এখানে ডিউক অব কর্নওয়াল ভূমিষ্ঠ হন। প্রাসাদের পঞ্চাশ ফুট লম্বা গ্যালারিতে নামজাদা শিল্পী ভ্যান্‌ডাইকের কতকগুলি অমূল্য ছবি আছে। এই গ্যালারির ছাদ হল কাঁচের।

বাকিংহাম প্যালেসে ঝি-চাকরের সংখ্যা কত জানেন? দু'শো। এদের কাজ হল সব সময় প্রাসাদটি ফিটফাট রাখা। আর রাজবাড়ির ঝি-চাকর হওয়া মুখের কথা নয়—হ্যারো-ইটনে ভর্তি হওয়ার চেয়েও কঠিন।

আর কর্মচারীরাও থাকে রাজার হালে। বিনি-পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা। একটু সর্দি-কাশি হয়েছে কি অমনি ডাক্তার এসে হাজির। 'এই যে মিঃ পল, কেমন বোধ করছেন? দেখি জিভটা। আহা-হা, উঠবেন না। উঠবেন না। রেস্ট নিন।' আমাদের মহামান্য কুইনের আদেশ কোন চাকর-বাকরের যেন চিকিৎসার ত্রুটি না হয়।

বছরে দুবার করে দামী স্যুট উপহার পান রাজবাড়ির কর্মচারীরা। এছাড়া আরও একটা বোনাস আছে। এটির দাম টাকায় শোধ হয় না। সেটি হল রাণীর সঙ্গে বছরে একদিন করমর্দনের সুযোগ।

সেটি হল খ্রীষ্টমাসের দিন। কর্মচারীরা ফিটফাট হয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকেন। দাঁড়ান সিনিয়রিটি অনুসারে। রাণী আসেন। সঙ্গে জন কয়েক অনুচর। তাদের হাতে নানারকমের উপহার। অনেককে রাণী চেনেন। তাদের নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন। 'হ্যালো জন, কেমন আছ? তোমার ছেলে-পুলেরা কেমন? হ্যালো অ্যানি,

তোমার মেয়েটির কি বে হয়ে গেছে? হ্যালো পল, এবার খুব শীত পড়েছে, তাই না?'

এ ছাড়া বছরে আর একদিন হয় স্টাফ-ড্যান্স। রাণী তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সঙ্গে নাচেন। এই নাচ চলে ঘণ্টা খানেক ধরে।

ইংলণ্ডের লোকের কাছে এই সম্মান সত্যিই দুর্লভ। সেখানে ব্রিটেনের ঈশ্বরীই জগতের ঈশ্বরী। গীর্জার সঙ্গে রাজমুকুটের লড়াই চলল বছরের পর বছর ধরে, কিন্তু জয় হল মুকুটেরই।

বিলেতে হাজার লোক নিয়ত প্রার্থনা করে ভগবান রাণীকে রক্ষা করুন। প্রতিদিন হাজার হাজার ভোজসভায় রাণীর স্বাস্থ্য-কামনায় টোস্ট উৎসর্গ করা হয়। সিনেমা থিয়েটারের শো ভাঙলে রোজ জাতীয় সঙ্গীত বাজে 'গড সেভ দি কুইন।' বিলেতের ঘরে ঘরে একটি ছবিই সাধারণতঃ দেখা যায়—সেটি হল রাণীর ছবি। সেক্সপীয়রের ছবি আমি কোন বাড়িতে দেখিনি। সেণ্ট অগস্টাইনের ছবিও নয়—শেলী, কীট্‌স, বায়রন, ডিকেন্স, অতবড় নেতা চার্চিল—সবই এহ বাহ্য। বিলেতের লোকেরা ওদের ভালবাসে মনে মনে, কিন্তু পূজোর বেলায় ওরা একেশ্বর।

বিলেতের খবরের কাগজ জুড়ে রাজ-পরিবারের খবর ছাপা হয়। জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, প্রেম, এমনকি রাজ-পরিবারের নানাবিধ রসাল কাহিনী নিয়ে খবরের কাগজের পাতা ভরাতে পারলে, সে কাগজ বাজারে পড়তে পায় না। বিলেতে সাংবাদিকদের মধ্যে যেমন নানান বিষয়ে স্পেশালিস্ট আছেন, তেমনি আছেন বাকিংহাম প্যালেস স্পেশালিস্ট।

রুদ্ধ প্রাসাদের আজবপুরীর ভেতর কোথায় কি হচ্ছে তা সাধারণ মানুষের কাছে চিরদিনের রহস্য। সেই রহস্যপুরী থেকে যদি দু-একটি চঞ্চল্যকর খবর কোন রকমে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিয়ে এসে কেউ বাজারে ছাড়তে পারেন, তিনিই হন ফ্লিট স্ট্রীটের বরেণ্য সাংবাদিক।

বিলেতের লোক রাণীর নামে পাগল। রাণীর যেদিন অভিষেক, সেদিন বিলেতের পাঁচ কোটি মানুষেরও যেন অভিষেক। রাণী যেদিন সন্তান-সম্ভবা, সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে ঘুম নেই। হাজার হাজার মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বাকিংহাম প্যালেসের সামনে। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর দিনে লক্ষ লক্ষ লোক কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। রাণী রাস্তা দিয়ে যাবেন—লণ্ডনের মানুষ কাজ ফেলে রেখে দিয়ে রাস্তার দুধারে লাইন করে দাঁড়াবে। অফিসের কেরানা থেকে অফিসারের দল কাজ ফেলে ছাদের ওপর উঠবে রাণীকে দেখবে বলে।

অথচ প্রধান মন্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণই নেই জনতার। বিলেতের প্রধানমন্ত্রীর হয়তো রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু গ্ল্যামার নেই। প্রধানমন্ত্রা সেখানে আর পাঁচজন ব্রিটনের মতই নাগরিক।

অনেক ঘটনার মধ্যে ইয়র্কের হোটেলে যে ঘটনাটি নিজে দেখেছি, সে ঘটনাটি বলি।

ইংলণ্ডের একটি বড় শহর ইয়র্ক। আমরা তখন সরকারী তত্ত্বাবধানে ব্রিটেন ট্যুর করছি। সবেমাত্র পৌঁছেচি ইয়র্কে। রেলের হোটেলে আমাদের জন্যে জায়গা রাখা হয়েছে।

রিশেপসন থেকে ঘরের চাবি দিয়ে দিল। ওপরের ষোল নম্বর ঘর। চাবি নিয়ে ওপরে উঠলাম। ঘর খুলতে যাচ্ছি এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে বললেন : কিছু মনে করবেন না স্যার, পাঁচ মিনিট যদি নীচের লাউঞ্জে অপেক্ষা করেন, তাহলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে?

—কেন বলুন তো?

—আজ্ঞে, আপনার ঠিক পাশের ঘরে, মানে সতেরো নম্বর ঘরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান। উনি এখুনিই চলে যাবেন। যদি একটু অপেক্ষা করেন—

লাউঞ্জে এসে বসলাম। কই, খোদ প্রধানমন্ত্রী এই হোটেলে,

অথচ হোটেলের চেহারা দেখে কিছু মালুম হচ্ছে না। লাউঞ্জে জন কয়েক লোক পাইপ টানছে আর খবরের কাগজ পড়ছে। হোটেলের দরজায় একটা পুলিস পর্যন্ত নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নামলেন লাউঞ্জ-স্যুট-পরা দীর্ঘদেহী এক বৃদ্ধ। হ্যাঁ, এই তো ম্যাকমিলান। যাঁকে আমি বহুবার দেখেছি! এ চেহারা তো ভুল হবার নয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আরও ক'জন ভদ্রলোক; হয়তো হোমরা-চোমরা অফিসার।

একটা বেয়ারা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে সেলামও করল না। একপাশে সরে দাঁড়াল। লাউঞ্জের ভদ্রলোকেরা একবার আড়চোখে প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আবার পাইপ টানতে লাগলেন।

অথচ প্রধানমন্ত্রী না হয়ে রাজ-পরিবারের কেউ যদি হতেন? যদি হতেন প্রিন্সেস মার্গারেট? প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রা? এমনকি রাজ-পরিবারের রাম-শ্যাম-যদু কেউ হলেই সাজ সাজ রব পড়ে যেত।

সব শুনে মিঃ ফ্রিগাড বললেন: আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? বাকিংহাম প্যালেস হল রূপকথার সেই মায়াপুরী। এই মায়াপুরীতে যারা থাকে, তাদের সম্পর্কে লোকের আগ্রহ প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও বেশী। কারণ বিলেতের লোক জানে, তাদের কেউ ইচ্ছে করলেই প্রধানমন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু রাজ-পরিবারের কেউ হতে পারবে না।

তবে যা বলছিলাম শুনুন: বাকিংহাম প্যালেসের জানালার সংখ্যা হল দশ হাজার। দৈনিক দশ জন করে লোক লাগে এই জানালা সাফ করতে। রাজপুরীর দামী সিলিংগুলো সাফ করার জন্যে দরকার হয় নানান ধরনের যন্ত্রপাতির।

যখন প্রাসাদের কোন ঘর পরিষ্কার হয়, তখন তার আগেই ঘরের একটি বড় সাইজের ফটোগ্রাফ তুলে রাখা হয়। পরে ঐ ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে ঘরের জিনিসপত্র আবার ঠিক করে রাখা হয়। এর ফলে বোঝা যায় ঘরের কোন জিনিসপত্র চুরি গেল কি-না।

এ বিষয়ে কুইন মেরীর চোখ ছিল খুব তীক্ষ্ণ। জিনিসপত্র একটু

এদিক-ওদিক নড়চড় হলেই রাণীসাহেবা ধরে ফেলতেন। 'উহু ঠিক হয়নি, এখানে একটা স্ট্যাচু ছিল বলে মনে হচ্ছে। সেই যে আইভরির লিনিং টাওয়ার, যেটি সেবার গ্রীসের রাজা দিয়ে গেলেন।' একবার ঠিক তাই হল। ঘরদোর চুনকাম করা হয়েছে, জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনি রাখা হয়েছে। কিন্তু কুইন মেরী এসে বললেন: হয়নি, কিস্যু হয়নি। দাস-দাসীরা ভয়ে জড়সড়। কোথায় ত্রুটি তারা কিছুতে বুঝতে পারছে না। রাণীসাহেবা বললেন, সপ্তম এডওয়ার্ডের স্ট্যাচুটা পাঁচ ইঞ্চি সরে গেছে।

অমনি ফটোগ্রাফ নিয়ে আসা হল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো। পাঁচ ইঞ্চি সরিয়ে স্ট্যাচুটা বসানো হয়েছে। অথচ কুইন মেরী এই ঘরে তিন বছর হল আসেন নি। মিঃ ফ্রিগাড বললেন: এসব গালগল্প বলে উড়িয়ে দেবেন না, এগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা। বাকিংহাম প্যালেসের ইতিহাস-বইতে এসব ঘটনা লেখা আছে। বানিয়ে বলছি বলে মনে করবেন না।

যখন রাণী বাকিংহাম প্যালেসে থাকেন, তখন পঁচাত্তর জন সশস্ত্র প্রহরী অনবরত বাকিংহাম প্যালেস পাহারা দেয়। এরা শুধু বিশ্বস্তই নয়, অনেকে আছে যারা দীর্ঘ পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে এই কাজ করছে। তারা প্রাসাদের প্রতিটি লোকের মুখ চেনে। কাজেই তাদের চোখ এড়িয়ে প্রাসাদে ঢোকা খুব অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু তাও নাকি হয়েছিল। সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড একদিন তাঁর ঘরে এসে দেখেন, কে একজন মজুর গোছের লোক তাঁর চেয়ারে বসে প্রাসাদের লেটারহেডে খুব তন্ময় হয়ে কি লিখে চলেছে। সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড আস্তে আস্তে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন লোকটি কয়েক লাইন লিখেছে: মা, আমি সম্প্রতি ঠিকানা বদল করিয়াছি। এখন হইতে আমাকে উপরের ঠিকানায় পত্র দিবেন।

বলাবাহুল্য, লেটারহেডের উপরেই বড় বড় করে লেখা— বাকিংহাম প্যালেস, লণ্ডন।

তারপর থেকে পাহারার আরও কড়াকাড় হল। এরপরে দু-একটি ছোটখাট ব্যাপার ছাড়া আর কিছু হতে শোনা যায়নি।

একবার একজন ধরা পড়ে প্যালেসের বাগানের ভেতর। ধরা পড়তেই সে বলেঃ কি করব হুজুর! রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দমকা বাতাসে মাথার হ্যাটটা উড়ে গিয়ে পড়বি তো পড় একবার বাগানের ভেতর। প্রাণের মায়া ছাড়তে পারি হুজুর, কিন্তু তাই বলে হ্যাটের মায়া তো ছাড়তে পারি না। হ্যাটটা কুড়োবার জন্যে এসেছিলাম।

আর একবার একজন বাজি রেখে মই বেয়ে প্রাসাদের পাঁচিলের ওপর উঠেছিল। সবচেয়ে মজা করেছিল দুজন দেহাতী লোক। রাতের বেলায় কখন যে প্রাসাদের ভেতর ঢুকে পড়েছে কেউ টের পায়নি। সকাল বেলা যেই বেরুচ্ছে, অমনি শান্ত্রীরা চেপে ধরল।

ঃ তোমরা কারা বটে হে?

জেরা করতেই বেরিয়ে পড়ল। ওয়েল্‌স্‌ থেকে লণ্ডন দেখতে এসেছে। রাত হয়ে গেছে দেখে ঠিক করল, এত রাতে কোথায় আর যায়। এত বড় রাজবাড়ি, এখানে কি রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে না? তা, এত সব হুজ্জতি হবে জানলে কে ঢুকতো এই রাজবাড়ির ভেতর?

বিলেতে মাতালদের গল্প আছে একজন মাতাল আর একজনকে বলছেঃ ভাবছি বাকিংহাম প্যালেসটা এবার কিনব।

আর একজন মাতাল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলঃ বুজরুকি মারার আর জায়গা পেলিনে? আমি বেচলে তবে তো তুই কিনবি!

মিঃ ফ্রিগাড বললেনঃ তা, বাকিংহাম প্যালেসটি কেনবার একবার সত্যি সত্যিই প্রস্তাব উঠেছিল। প্রস্তাবটা দিয়েছিল লণ্ডনের একটা হোটেল-কোম্পানি। দাম উঠেছিল সাত কোটি টাকা। সে সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জের আমল।

সম্রাট বললেনঃ অলরাইট। আমি প্যালেস বিক্রি করতে

রাজী আছি। কিন্তু প্যালেসের বাইরেটা এখন যেমন আছে, চিরকাল অমন রাখতে হবে।

হোটেলের কোম্পানি রাজী হল না।

সম্রাট বললেনঃ তাহলে আর হল না। আমার প্রাসাদের অমর্যাদা হবে। আমি প্রাসাদ বেচব না। গুডবাই।

বিলেতে রাজতন্ত্রের বয়স এখন বারোশো বছর।

বিলেতের জনসাধারণ এখন রাজ-পরিবারকে বছরে আটাত্তর লক্ষ টাকা করে বেতন দেন।

এটি হল প্রিভিপার্স। তাছাড়া রাজ-পরিবারের খাস সম্পত্তিও আছে। রাজ-পরিবারের বড় বড় অনুষ্ঠান হলে, তার জন্যে আছে আলাদা টাকা।

অনেককে প্রশ্ন করেছি ঃ রাজতন্ত্রের পিছনে এত টাকা আপনারা খরচ করেন ?

উত্তরে তাঁরা বলেছেন ঃ রাজা না থেকে যদি নিয়মতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্রপ্রধান থাকত তাহলেও তো খরচ হত। তোমাদের রাষ্ট্রপতি আর রাজ্যপালের পিছনে কম টাকা খরচ হয় ?

--এত বিরাট জাঁকজমকেরই বা কি দরকার ?

—দেশের লোক রাজ-পরিবারকে টাকা দেয় তার বদলে শো আশা করবে না ?

রাজকুমারী মার্গারেটের বিবাহে সরকারী তহবিল থেকে যখন আট লক্ষ টাকা খরচ করা হল, তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠল হাউস অব কমন্সে।

ঃ স্পীকার স্যর, আমরা মনে করি এই অর্থ বিরাট অপব্যয়··· আমরা মনে করি···

বিখ্যাত নাট্যকার জন অসবর্ন এই উৎসব-সজ্জাকে বিদ্রূপ করে ট্রিবিউন পত্রিকায় একটি কবিতা লিখলেন।

কিন্তু তবু মার্গারেট বলে কথা। বাকিংহাম প্যালেসের সবচেয়ে

বড় আকর্ষণ এখন কে ? কুইন এলিজাবেথ ? আজ্ঞে না। প্রিন্স ফিলিপ ? হাসালেন মশায়। তবে কি প্রিন্সেস মার্গারেট ? আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। প্যারিতে এসে ট্যুরিস্টরা নাকি জিজ্ঞাসা করে : তোমাদের নেতার সঙ্গে দেখা হবে পরে, আগে আমাকে নিয়ে চল ব্রিজিট বারডটের কাছে। ঐ ট্যুরিস্টরা লণ্ডনে এলে বলতেন : চার্চিলের সঙ্গে পরে দেখা করব মশায়, আগে আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন প্রিন্সেস মার্গারেটের।

কথাটা সত্যি। রাণী এলিজাবেথের বিবাহের দিন এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপ এসে দাঁড়ালেন বাকিংহাম প্যালেসের ব্যালকনিতে। জনতা মহানন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে একটি আওয়াজ উঠল : আমরা মার্গারেটকে চাই। মার্গারেট এসে দাঁড়ালেন, অমনি জনতা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল।

একটি আমেরিকান কাগজে বেরিয়েছিল : মার্গারেট আজ ব্রিটেনে সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয়। হাউস অব কমন্সে কী ঘটেছে না ঘটেছে, আর ডলার-সঙ্কটের পরিণতিই বা কী, তার চেয়ে লোকে এখন জানতে চায় মার্গারেটের কথা।

মার্গারেটের বিবাহ-উৎসব তাই বিলেতে জাতীয় উৎসব।

রাজ-পরিবারের কারুর বিবাহ নিয়ে এর আগে বোধহয় বিলেতে এত বিরাট সমারোহ দেখা যায়নি।

বিবাহ-উৎসবের কথা পরে বলব। তার আগে রাজকুমারী মার্গারেটের জীবন-কথা বর্ণনা করি। উপন্যাসের চেয়েও চমৎকার সে জীবন-কথা।

॥ চৌদ্দ ॥

ইয়র্কের ডিউক মেয়ের নাম দিয়েছিলেন মার্গারেট—রোজ মার্গারেট। মার্গারেট একটি ফুলের নাম। ফুলের মত মেয়ের ফুলের নামে নাম।

প্রথম মেয়ে এলিজাবেথ। ডিউকের মনে ছিল আশা, এইবার হয়তো হবে একটি প্রাসাদ আলো-করা ছেলে।

কিন্তু হাউস অফ ইয়র্কের ধাই এসে সংবাদ দিল ইয়র্কের ডিউক আর-একটি কন্যার জনক হয়েছেন। সংবাদটিকে খুশি মনে গ্রহণ করতে পারেন নি ডিউক। কিন্তু নবজাত শিশু-কন্যাটিকে দেখে তাঁর মন হল সংযত। কী সুন্দর, কী স্বর্গীয়! এ যেন প্রথম শরতে সেণ্ট জেম্‌স্ পার্কে ফোটা একগুচ্ছ রক্ত-গোলাপ। ডিউকের অশান্ত হৃদয়ে এক নিমেষে পিতৃস্নেহের বান জাগল।

আবার তেমনি করে সেদিন ফ্লিট স্ট্রীটে দ্বিগুণ কর্মব্যস্ততা জেগে উঠল। যেমন চার বছর আগে রাজকুমারী এলিজাবেথের শুভ জন্ম-লগ্নে ফ্লিট স্ট্রীট উঠেছিল চঞ্চল হয়ে। ইথারে ইথারে ভেসে বি. বি. সি-র সংবাদ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীকে জানিয়ে দিল, গ্ল্যামিস দুর্গে এক নূতন আগন্তুকের আগমন-বার্তা।

হাজার হাজার টেলিগ্রাম আর ফুলের তোড়া এসে স্তূপাকার হল গ্ল্যামিস দুর্গে। সারারাত ধরে চলল আতসবাজির হররা। আর কয়েক শত ব্যাণ্ড ও ব্যাগপাইপের ঐকতানে মুখরিত হয়ে উঠল ইংলণ্ডের আকাশ-বাতাস।

আড়াই মাসের মেয়েকে কোলে করে গ্ল্যামিস থেকে ডিউক আর ডাচেস এসে পৌঁছলেন বাকিংহাম প্যালেসে।

প্যালেসের প্রাইভেট চ্যাপেলে শিশুকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা

হবে। ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ এসে বাইবেল থেকে মন্ত্রপাঠ করে বললেন: আমেন! তারপর জর্ডন নদীর পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন শিশুর সর্বাঙ্গে।

আরও কিছুকাল পরে কোন এক রৌদ্রস্নাত সকালে, অথবা অপরাহ্নে লণ্ডনের মানুষ পিকাডালির ১৪৫নং বাড়িটার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে যেত। ডিউক অফ ইয়র্কের লণ্ডন-প্রাসাদের লনে, যেখানে হাজার ড্যাফোডিল, প্রিমরোজ আর টিউলিপের মেলা, তার মাঝে দুটি ফুলের মত ছোট্ট মেয়ের নিত্য লুকোচুরি খেলা।

ওয়েল্‌সের কোন গাঁ থেকে আসা দেহাতী মানুষ মাথার টুপিটা খুলে ফিস ফিস করে পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করত—কে গা, কাদের মেয়ে ও দুটি?

উত্তর পেত—সেকি, তাও জান না, ওদেরই নাম তো এলিজাবেথ আর মার্গারেট। আমাদের ডিউকের মেয়ে।

মাঝে মাঝে সবুজ স্কটল্যাণ্ডের পাইন আর ওকগাছের ছায়াভরা গ্ল্যামিস, মাঝে মাঝে লণ্ডন। গ্ল্যামিস তাকে দিয়েছে কমনীয়তা, লণ্ডন দিয়েছে স্থৈর্য। তবুও এরই মাঝে মাঝে উইণ্ডসর দুর্গে ঠাকুর্দা পঞ্চম জর্জের সঙ্গে মাঝে মাঝে কিছুদিন কাটিয়ে আসত মার্গারেট।

বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট পঞ্চম জর্জ। যাকে বলে রাজ-চক্রবর্তী। ভয়ে যত ভূপতি তটস্থ। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন অবাধ্য প্রজা ভয় করে না সম্রাটকে। সে মার্গারেট। উইণ্ডসর ক্যাসেলে এলেই আর রক্ষা নেই। গুরুতর রাজকার্যে ব্যস্ত সম্রাট। কোথা থেকে মার্গারেট এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাঁর কোলে। সম্রাটের গলা জড়িয়ে ধরে মার্গারেট তাঁকে ডাকত 'গ্র্যাণ্ডপাপা ইংলণ্ড' বলে।

তারপর একদিন মৃত্যু নেমে এল বাকিংহাম প্যালেসে। কোন রুপালী ভোরে যখন ধীর-প্রবাহিনী টেম্‌সে সোনালী সূর্যের ঝিলিমিলি,

তখন লণ্ডন শহরের গীর্জায় গীর্জায় বেজে উঠল মৃত্যুর অশান্ত ঘণ্টাধ্বনি। পিকাডালির বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুই শিশু দেখেছিল এক অতিকায় পাইথনের মত বিরাট, বিমর্ষ মানুষের শবযাত্রা। মৃত্যুর বিভীষিকা তাদের কাছে তখনও ছিল অজ্ঞাত। বেদনার হিমবাহ তারা কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি তাদের কিশোর জীবনে। সেদিনও তারা বোঝেনি কিছু। শুধু দেখেছিল বাকিংহাম প্যালেসে গেলে তাদের সব থেকে প্রিয়জন গ্র্যাণ্ডপাপা ইংলণ্ডকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পঞ্চম জর্জের সিংহাসনে বসলেন তাঁহার বড় ছেলে ডেভিড। নতুন সম্রাটের নাম হল এডওয়ার্ড—সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড।

পৃথিবীর সম্রাটদের মধ্যে অষ্টম এডওয়ার্ডের নাম লেখা থাকবে উজ্জ্বল অক্ষরে। সুশাসক হিসাবে নয়, পাণ্ডিত্যে নয়, কূটনৈতিক পারদর্শীতায় নয়, লেখা থাকবে প্রেমিক হিসাবে। প্রেমের এতবড় মূল্য আর কোন সম্রাট পৃথিবীতে দিয়েছেন কিনা তা অনেকেরই অজানা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজ ভালবাসেন এক সামান্যা আমেরিকান মহিলাকে। তাও শ্রীমতা সিমসন বিবাহিতা। এ বিবাহ হতে গেলে বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের সমর্থন প্রয়োজন, আর ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের প্রচলিত কনভেনশন অনুসারে একবার বিবাহিতা এমন কোন মহিলার পাণিগ্রহণ সম্ভব নয় রাজকীয় পরিবারের কারও পক্ষে।

ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ ডাঃ কোসমো ল্যাং বললেন—দুটোর মধ্যে যে-কোন একটা বেছে নিন্ সম্রাট, হয় স্ত্রী, নয় রাজ্য।

সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড হেলায় পরিত্যাগ করেছিলেন আপন সাম্রাজ্য। কোহিনুর-মাণিকখচিত রাজমুকুট মাথা থেকে খুলে নামিয়ে রেখেছিলেন সিংহাসনের ওপর।

অতএব সিংহাসনে বসলেন তাঁর ভাই ইয়র্কের ডিউক। এলিজাবেথ ও মার্গারেটের জনক।

১৪৫নং পিকাডালির বাড়িটাকে জন্মের মত বিদায় দিলেন ওঁরা। ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের নাটকের দৃশ্যপট হল পরিবর্তিত।

শুধু দুটি মেয়ে। কোন ছেলে নেই সম্রাটের। সব সময়েই মন খুঁতখুঁত করে। কে হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী? অনেকে বললেন দুজনেই। এলিজাবেথ ও মার্গারেট দুই বোনই পাবেন সিংহাসনের সমান অংশ।

এ সম্পর্কে সন্দেহ-নিরসন করলেন স্যর জন সাইমন। সে সময়কার হোম সেক্রেটারি। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে হাউস অফ কমন্সে ঘোষিত হল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একমাত্র ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রাজকুমারী এলিজাবেথ। এলিজাবেথ তখন জীবনে এগারোটি বসন্ত অতিক্রম করেছেন।

একদিন রোমান হলিডে-র নায়িকা হল দুই কন্যা। মা-র কাছে আর্জি গেল লণ্ডনের টিউব দেখতে যাব। ছাড়পত্র মিলল প্রাসাদের বাইরে যাবার। দুই বোন এলিজাবেথ ও মার্গারেট এবং পরিচারিকা লেডি হেলেনকে নিয়ে একদা বাকিংহাম প্যালেস থেকে একটি সুদৃশ্য গাড়ি এসে থামল সেণ্ট জেম্‌স্‌ টিউব-স্টেশনে।

আজ ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ যেখানে যান, প্রোটোকলের কড়া শাসন, হাজার শান্ত্রীর কড়া পাহারা। সেদিন কিন্তু লণ্ডনের ব্যস্ত মানুষগুলোর মাঝে নিমেষে হারিয়ে যেতে পেরেছিলেন এলিজাবেথ ও মার্গারেট।

অটোমেটিক মেশিনে পয়সা ফেলে মার্গারেট টিকিট কেটেছিল, তারপর গেটের কালেক্টরের কাছে টিকিট ক'টি গর্বভরে এগিয়ে দিয়েছিল। প্রথমে গিয়েছিল চেয়ারিং ক্রশে, সেখান থেকে টোটেনহাম কোর্ট রোড।

বইয়ের পড়া টোটেনহাম কোর্ট রোড। কাঁচের আলমারিতে সাজানো কোন এক বইয়ের মলাট হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল

মার্গারেটকে। ও থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। লেডি হেলেনের ডাকে চমক ভেঙেছিল বুঝি মার্গারেটের।

তারপর ওয়াই. ডব্লু. সি. এ. হেড কোয়ার্টার্সের সেল্‌ফ্‌ সার্ভিস রেস্টুরেণ্টে গিয়ে সকলের সঙ্গে বসে খাওয়া। নিজের হাতে খাবার-গুলি তুলে নিতে হয়েছিল। তারপর আবার ফেরার পালা।

সেদিন লণ্ডনের লোক ভাবতে পারেনি গ্রেট ব্রিটেনের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী এলিজাবেথ ও গ্রেট ব্রিটেনের রাজকীয় ইতিহাসে চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারিণী মার্গারেট তাদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুধু সেণ্ট জেম্‌স্‌ পার্ক স্টেসনের টিকিট-কালেক্টরের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। সমীহ করে সে রাজকুমারীদের বলেছিলঃ তাদের টিকিট ক'টি সে সযত্নে তুলে রেখে দেবে। তার টিকিট-কালেক্টরের জীবনের সবচেয়ে বড় স্মারক-চিহ্ন।

রাজকীয় অভিষেকের পর ইয়র্কের ডিউক হলেন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ। আর তার কিছুকাল পরেই সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে যেতে হল কানাডা সফরে।

এই প্রথম বিচ্ছেদ। সম্রাট-সম্রাজ্ঞী কানাডায়—কিন্তু মন পড়ে আছে দূরে বাকিংহাম প্যালেসে দুটি শিশুর মাঝে। গুরুতর কূটনৈতিক কার্যের মধ্যেও তাঁরা নিত্য চিঠি লেখেন তাদের, পাঠান ছবি, স্যুভেনির। তারপর একদিন অটোয়া থেকে ট্রাঙ্ক-কল ভেসে এল। ফোন ধরেছিল মার্গারেট। বাবা-মার গলার আওয়াজ পেয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিল অধীর আনন্দে। ছুটে এসেছিল এলিজাবেথ।

—তাড়াতাড়ি ফিরে এস ড্যাডি, বড় মনকেমন করছে মামী।

—লক্ষ্মী হয়ে আছ তো সোনামণিরা আমার? হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরটিতে স্নেহ ঝরে পড়েছিল যেন।

আরও অনেক অনেক বছর পরে কলকাতার রাজভবনের প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ স্যুটে বসে এমন ভাবে টেলিফোন করেছিলেন সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ সাত হাজার মাইল দূরে বাকিংহাম প্যালেসে যেখানে

তাঁদের আগমন-প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন গুণছে প্রিন্স চার্লস, রাজকুমারী অ্যান।

সেদিন টেলিফোন পেয়ে নিশ্চয়ই অমন করে অধীর আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিল ওরা।

—তাড়াতাড়ি ফিরে আসছ তো মামী?

সেই একই প্রশ্ন। সেই একই মিনতি। সেই একই অধীর আগ্রহে দিন গোণা।

সেদিন বুঝি গ্রেট ব্রিটেনের অধিশ্বরী কমনওয়েল্থের প্রধানা সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ অশ্রু-সংবরণ করতে পারেন নি। রেসকোর্সের সংবর্ধনা-সভায় এসে তিনি ক্ষণে ক্ষণে হয়েছিলেন অন্যমনা। মহান অধিশ্বরীর মনস্তুষ্টির জন্য কোন আয়োজনই তো অসম্পূর্ণ রাখেন নি সেদিন পশ্চিম-বঙ্গের সদাশয় সরকার। বাইরে লক্ষ বিজলিবাতির আলোয় ঝলমলে জব চার্নকের আজব নগরী কলকাতা। আর ব্রিটিশ হাই কমিশন আয়োজিত সে সংবর্ধনায় শহরের সবচেয়ে সুখী ব্যক্তিরাই তো ছিলেন আমন্ত্রিত। গাড়ি, অলংকার আর মদিরার প্লাবনে সে রাত্রিটি ছিল বিশেষ আনন্দের রঙে চিহ্নিত। তবে কেন বিষাদমগ্না ছিলেন সম্রাজ্ঞী? সে রাতে কি মনে পড়েছিল তাঁর সুদূর কৈশোরে প্রবাসী মাতা-পিতার জন্য একদিন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষার কথা?

সাংবাদিকরা পাননি মাতৃহৃদয়ের অন্তস্থলের সংবাদ। তাই তাঁরা লিখেছিলেন: 'রাণী কি ক্লান্ত?'

জীবনের পঞ্চদশ বসন্তের এক সুপ্রভাতে মার্গারেট দেখেছিলেন টাউনসেণ্ডকে। নাম তার পিটার টাউনসেণ্ড। ১৯১৪ সালে রেঙ্গুনে জন্ম। 'হেলিবারি'র শিক্ষার রঙ খুব জোর করে এঁটে বসেছে তাঁর গায়ে। প্রায় ছ'ফুট উঁচু খাপখোলা তলোয়ারের মত ধারালো চেহারা। একটি খাঁড়ার মত নাক। সেটি শুধু শ্রী নয় ছন্দ।

ভারতীয় গোরা সৈন্যদলের প্রাক্তন লেঃ কর্নেল ই. সি.

টাউনসেণ্ডের ছেলে পিটার আজন্ম সৈনিক। তবে মাটির চেয়ে আকাশ তাঁকে খুব বেশী করে টানে। জীবনের শূন্যতা ভরাবার জন্যই যেন শূন্যে গা ভাসিয়েছেন পিটার টাউনসেণ্ড। যুদ্ধ এল। আর অমনি রাজকীয় বিমান-বাহিনীতে যোগ দিলেন পিটার। সুদক্ষ পাইলট টাউনসেণ্ড। ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে ওঠবার কৌশল তাঁর কাছে অজানা নয়। ক'দিনের মধ্যেই স্কোয়াড্রন-লিডার। তারপর এক গভীর রাতে আড়াইশো জার্মান বিমানকে টেমস্ নদীর জলে সমাধি দিয়ে আদায় করলেন রাজকীয় সম্মান আর জনপ্রিয়তা।

আজন্ম সৈনিক টাউনসেণ্ড। বিবাহ করলেনও সৈনিকের মেয়েকে। রোজমেরির বাবা ছিলেন ব্রিগেডিয়ার, আর জয় করে এনেছিলেন রাজকীয় খেতাব। যোগ্য জামাতাকে দেখে যেতে পারেন নি হানবারি পাওয়েল, সি-বি-ই। তাঁর বিধবা স্ত্রী কন্যা-সম্প্রদান করলেন।

রোমান্সের অবকাশ নেই সৈনিকের জীবনে। ও সব সিভিলিয়ানদের জন্য। বায়রন সৈনিক ছিলেন একথা মানেন টাউনসেণ্ড, কিন্তু ডন জুয়ান সৈনিকদের জন্য নয়। তাই বিয়েতে কোন ধূম হল না, হার্টফোর্ডশায়ারেব এক ছোট্ট গ্রাম্য গীর্জায় নিরাড়ম্বর ভাবে বিবাহ হল টাউনসেণ্ডের। তারপর নমো-নমো করে হনিমুনটা চুকিয়ে আবার পাইলটের পোশাক পরলেন পিটার টাউনসেণ্ড।

বাকিংহাম প্যালেস থেকে আহ্বান এল। তাঁর সেবায় খুব খুশী হয়েছেন সম্রাট। তারই প্রতিদান স্বরূপ পুরস্কার। এবার আর আকাশ নয়, অবকাশ। আশমান নয়, জমিন। বাকিংহাম প্যালেসে সম্রাটের ব্যক্তিগত সামরিক কর্মচারী হবার মত সম্মান পাবেন টাউনসেণ্ড।

এই বাকিংহাম প্যালেসে সর্বপ্রথম টাউনসেণ্ড দেখলেন মার্গারেটকে। একত্রিশ বছরের পিটার দেখল পনেরো বছরের রোজকে। রোজালিণ্ড দেখল টাটনসেণ্ডকে। দুষ্মন্ত দেখল শকুন্তলাকে।

পঞ্চদশী মার্গারেটের ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী তখন অবনী বহিয়া যায়। এ তো রোজমেরি নয়, রোজ মার্গারেট। আলো নয়, আলেয়া। তবু তারই মোহে অন্ধ হলেন টাউনসেণ্ড।

টাউনসেণ্ড দুদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন প্যালেসে। স্যাভয় থিয়েটারে 'ফার্স্ট জেণ্টলম্যান' অভিনয় দেখার বাসনা জাগল মার্গারেটের। কিন্তু সঙ্গে যাবে কে? কেন টাউনসেণ্ড? সম্রাট আপত্তি করলেন না। সুন্দর, সুপুরুষ, বীর সৈনিক টাউনসেণ্ড সুযোগ্য দেহরক্ষী। কাজেই ব্রিটেনের সংবাদপত্রে বার হল: রাজকুমারী আসবেন অভিনয় দেখতে, সঙ্গে আসবেন টাউনসেণ্ড।

কিন্তু শুধু থিয়েটার নয়, যেখানে মার্গারেট সেখানে ছায়ার মত বিশ্বস্ত দেহরক্ষী এয়ার স্কোয়াড্রন টাউনসেণ্ড। সবশেষে আহ্বান এল: রাজ-পরিবার যাবেন আফ্রিকা-পরিভ্রমণে। সঙ্গে যেতে হবে টাউনসেণ্ডকে। যাত্রার আয়োজন করতে করতে প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর নামে একটা চিঠি পাঠালেন টাউনসেণ্ড। 'প্রিয়তমে আমার, দুঃখ কর না, দু'বছরের বিচ্ছেদ দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

আসন্ন যাত্রার উদ্যোগ-পর্বে মুখরিত হয়ে উঠল বাকিংহাম প্যালেস। ব্রিটেনে তখন কাপড়ের কণ্ট্রোল। হাউস অফ কমন্স পার্লামেণ্টে আইন পাস করল—রাজ-পরিবার যাতে প্রয়োজনমত বস্ত্রের পারমিট পান।

লণ্ডন থেকে প্রথমে যুদ্ধ-জাহাজে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত। সেখানে সফর-সূচী দু'মাসের, কাজেই বার্মিংহামের রেল-কারখানায় বিশেষ ধরনের স্পেশাল ট্রেন নির্মাণের অর্ডার গেল।

এক মাইল লম্বা ছিল ট্রেনটি। এতবড় ট্রেন দক্ষিণ আফ্রিকায় এর আগে চলেনি। মাঝখানে সম্রাটের অফিস। পাশে তাঁর ব্যক্তিগত ড্রইং-রুম, শয়নকক্ষ, রাজ-পরিবারের প্রতি জনের জন্য বিশেষ ভাবে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্বতন্ত্র কামরা।

এর মাঝে এলিজাবেথের জীবনে এসেছে প্রেম। প্রহরশেষের

আলোয় রাঙা কোন এক চৈত্রমাসে রাজকন্যা দেখেছেন এক গ্রীক রাজপুত্তুরকে। নাম তাঁর ফিলিপ। সম্পর্কে আর্ল মাউণ্টব্যাটেনের ভাগিনেয়। স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত গুরভোনস্টোন স্কুলে পড়াশুনো করতে এসেছিলেন প্রিন্স। একজন ছিলেন এথেন্সে, একজন লণ্ডনে, মাঝখানে অনেক নদীর ব্যবধান। কিন্তু সব ব্যবধান দূর করে দুটি হৃদয় মিলল একদিন।

দু'মাসের বিচ্ছেদ। যে প্রেমের চরম প্রাপ্তিতেও পরম বেদনার ঝরনাধারা। দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। সেখানে দু'মাসের অদর্শন কি করে সহ্য করেন সপ্তদশী এলিজাবেথ?

কাজেই এলিজাবেথ তাঁর অস্থায়ী শয়নকক্ষে ব্যক্তিগত টেলিফোনের ব্যবস্থা করলেন।

রাজকীয় জাহাজ 'ভ্যানগার্ড' সমুদ্রে ভাসল। বিস্কে উপসাগর থেকে মরক্কোর উপকূল, সেখান থেকে কলমার উপসাগর। ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ তাঁর সিনে ক্যামেরায় সমস্ত চলমান দৃশ্যকেই ধরে রাখলেন।

নাচ, গান, মদিরা আর আনন্দ। দুটি তরুণীর হৃদয় কি বাইরের সমুদ্রের চেয়ে কম উত্তাল? পিটার আরও কাছে সরে এল রোজের। জাহাজের ভেতর ষোল ফুট চওড়া সুইমিং-পুল। সেখানে দুটি মরাল-মরালীর নিত্য সন্তরণ। তারা মার্গারেট আর টাউনসেণ্ড।

বিষুবরেখা অতিক্রম করল ভ্যানগার্ড। আর সেই সঙ্গে প্রথম প্রেমের সঙ্কোচের সূক্ষ্মরেখা অতিক্রম করল দুই বিমুগ্ধ নর-নারী।

আর বছর দুয়েকের মধ্যে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ এলিজাবেথের এনগেজ-মেণ্ট ঘোষণা করলেন। পাত্র সেই গ্রীক রাজপুত্র ফিলিপ। তবে গ্রীসদেশের সিংহাসন হেলায় পরিত্যাগ করে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন।

এলিজাবেথের বিবাহের ক'দিন আগে মার্গারেট গেলেন উত্তর

আয়ার্ল্যাণ্ড সফরে। একাকিনী নন, সঙ্গে গাইড ও গার্ডিয়ান হিসাবে টাউনসেণ্ড।

এলিজাবেথের বিবাহের দিন লণ্ডনে আবার আনন্দের বন্যা। ওয়েডিং কেক কাটার পর ব্যালকনিতে এসে নব-দম্পতী দর্শন দেবেন প্রজাদের। বাকিংহাম প্যালেসের সামনে ম্যালে সেদিন হাজার হাজার মানুষের জনস্রোত। সম্রাট-সম্রাজ্ঞী এলেন। অভিনন্দন জানিয়ে জনতা বলল—আমরা মার্গারেটকে দেখতে চাই। মার্গারেট এলেন। জনতা করতালিতে ফেটে পড়ল।

এই সময় মার্গারেটের জীবনে এল দুরন্ত পাহাড়ী ঝরনার মত উচ্ছল একটি মেয়ে। লণ্ডনের আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের একমাত্র কন্যা শারমান ডগলাস।

আবার আনন্দ। প্রতি সন্ধ্যায় নিত্য-নতুন ছেলের সঙ্গে নাচ, দল বেঁধে থিয়েটার দেখতে যাওয়া। মার্কিনী মেয়ে শারমান ডগলাস মার্গারেটকে শেখাল কি করে যৌবনকে উপভোগ করতে হয়।

মার্গারেটের সঙ্গে ড্যানি কে-র পরিচয় করিয়ে দিল শারমান। মার্গারেট পাগল হয়ে উঠলেন যেন। ড্যানি কে-র রেকর্ড এনে জড় করলেন প্রাসাদে। ড্যানি কে-র কোন অনুষ্ঠান হলেই তা থেকে বাদ পড়তেন না।

আর স্বয়ং ড্যানি কে-র কাছ থেকে তিনি নিলেন রক অ্যাণ্ড রোল ও চা-চা চা-র শিক্ষা।

রোজ রাতে নৈশ-ক্লাবে নাচ। মার্গারেটকে ঘিরে তখন গুণমুগ্ধ ভক্তদের চক্র। শারমান বলে—ফুল থাকলেই আসবে মৌমাছিরা। তারা যদি নাই এল, তাহলে কোথায় ফুল হবার সার্থকতা ?

রাজকীয় পরিবারের প্রণয় নিয়ে কেচ্ছা—ব্রিটিশদের কয়েক শতাব্দীর অভ্যাস। এ অভ্যাসে ইন্ধন জুগিয়েছে ফ্লিট স্ট্রীট। তারাই লিখল—রাজকুমারী মার্গারেটের চক্র। প্রিন্সেস মার্গারেটস্ সেট।

এক সেট ছেলে—শারমানের ভাষায় মক্ষিকা। প্রত্যেকেই

খানদানি বংশের। রূপে-গুণে, বংশ-মর্যাদায় বাকিংহাম প্যালেসের জামাই হবার পক্ষে উপযুক্তই বটে। আর সবচেয়ে মজার কথা মার্গারেট সকলের সঙ্গেই এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশছেন যে, অবশেষে কার গলায় মালা পড়বে তা যেন রহস্যাচ্ছাদিত।

তবু অনেকে বলল—টাউনসেণ্ড সাহেবের কপাল নেহাত মন্দ। রুমানিয়ার রাজকুমার মাইকেলকে বেশী করে মনে ধরেছে রাজ-কুমারীর। প্রিন্স মাইকেল এখন আর সত্যিকারের প্রিন্স নন। কম্যুনিস্ট রুমানিয়া থেকে তিনি বিতাড়িত। লণ্ডনে এসেছিলেন এলিজাবেথের বিবাহের নেমন্তন্ন খেতে।

সৌম্য, সুন্দর রাজপুত্রকে নাকি একটু বিশেষ অনুগ্রহ করতেন মার্গারেট। তাই নৈশ-নৃত্যে ঘন ঘন তাঁর পার্টনার হত রুমানিয়ার রাজকুমার।

কিন্তু দেখা গেল, গুজব গুজব মাত্রই। যার রাজ্য নেই, তার সঙ্গে আবার বিয়ে! রাজকুমার মাইকেল বুদ্ধিমান, মার্গারেটের প্রত্যাশায় সমস্তকাল অপেক্ষা না করে তিনি বিবাহ করে বসলেন বোরবন পারমার রাজকুমারী অ্যানকে।

মধুচক্রের আর একজন মিলফোর্ড হ্যাভেনের মারকুইস ডেভিড। নিউইয়র্কের ওয়ালডর্ফ্ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় শারমান ডগলাসের। শারমানের সঙ্গে মারকুইসের বন্ধুত্বটা নাকি খুব বেশী ঘনিষ্ঠই ছিল। পুরাতন বন্ধুকে মার্গারেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল শারমান।

ধনী ব্যবসায়ী মারকুইস। তেলকলের যন্ত্রপাতির ব্যবসা করেন। রোমান্সের ধার ধারেন না। তবে সুন্দরী তরুণীদের সান্নিধ্য একটু বেশী করেই পছন্দ করেন। তবে তা শুধু বেঁচে থাকারই অঙ্গ হিসাবে। যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন মারকুইস। জানেন, যন্ত্রপাতি রাখতে গেলে তার পরিচর্যার প্রয়োজন হয়।

ফ্লিট স্ট্রীট থেকে টেলিফোন এল : হ্যালো, গুড মর্নিং, কথাটা কি

সত্যি? মানে আপনার ইয়ে—প্রিন্সেসের সঙ্গে আপনি শীঘ্র এনগেজমেণ্ট ডিক্লেয়ার করতে যাচ্ছেন? কথাটা বাজারে রটে গেছে কিনা, মানে, আমাদের একটা দায়িত্ব আছে তো, যদি কথাটা ঠিক না হয় তাহলে—

টেলিফোনের ওপাশ থেকে মারকুইস বলেন: আরে, হাসালেন মশায়! উপযুক্ত রোজগার না করে বিয়ের কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। মাত্র এক হাজার পাউণ্ড নিয়ে কারবারটা শুরু করেছি মশায়। এখনও অনেক টাকা রোজগার করতে হবে। ওসব গুজব ভিত্তিহীন। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ, গুডবাই।

একখানি ফরাসী সংবাদপত্র এইবার একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করল—যার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়: আর গুজব নয়, আর গুজব নয়, মার্গারেট এইবার প্রোপোজ করিবেনই। পাত্রটি ব্লাণ্ডফোর্ডের মারকুইস। আগামী অমুক তারিখে অমুক সময়, অত সেকেণ্ড গতে রাজকুমারীর নিকট মারকুইস অথবা মারকুইসের নিকট রাজকুমারী কেহ না কেহ পাণিপ্রার্থনা করিবেনই। আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি।

ঐ তারিখে ছিল মার্গারেটের অষ্টাদশ জন্মতিথি।

মার্গারেট বলত 'সানি'। তা, দীর্ঘদেহী অনিন্দ্যসুন্দর মারকুইস সূর্যালোকের মতই উজ্জ্বল যেন। মাথায় একমাথা রেশমী চুল। যেন মিকেল এঞ্জেলোর ডেভিড। আর বংশমর্যাদায় তিনি রাজকুমারীর যথাযোগ্য। ঠাকুর্দা ছিলেন ডিউক, বাপ প্রাক্তন গার্ডসম্যান আর স্বয়ং ব্লাণ্ডফোর্ডের মারকুইস।

১৯৪৮ সালটিকে লোকে বলত ব্লাণ্ডফোর্ডের বসন্ত। এ বসন্তে ছুটি কোকিলের শুধু মুগ্ধ কূজন। মারকুইস-মার্গারেট।

তারপর একদিন ফরাসী পত্রিকায় ঘোষিত সেই বিশেষ দিনটি এল।

ঐদিন মার্গারেট তাঁর বাবা-মা, মেয়ে-বন্ধুদের আর মারকুইসকে নিয়ে গেলেন সমুদ্র-সৈকতে পিকনিকে।

এদিকে সমস্ত ইওরোপের মানুষ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে, পরদিনকার সংবাদপত্রে বিবাহের সংবাদ ছাপা হবে।

কিন্তু তা হল না। তার পরদিনও না, তারপরেও না। সমুদ্র-সৈকতের বালুভূমির নির্জনতায় তাঁদের দুজনে কি কথা হয়েছিল, তা জানেন স্বয়ং মনসিজ, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে থেকে গেল তা অজ্ঞাত।

এমনি করে তারও কতজনের নামের সঙ্গে মার্গারেটের নাম। বিলি ওয়ালেশ, এক ক্যাপটেনের ছেলে, এর সঙ্গে স্পোর্টস কার চালাতে বার হতেন মার্গারেট, ডেলকেইথের আর্ল, যার ডাক-নাম ছিল জনি, এবং আর একবার সংবাদপত্রে যার সঙ্গে মার্গারেটের বিবাহের সঠিক তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু মার্গারেট-চরিত্র তখনও দেবাঃ ন জানন্তি।

মার্গারেটের জীবনে এল ফুলফোটার লগ্ন।

'ফুটল মার্গারেট ফুল।' এ-কথা লিখল আমেরিকার একটি ম্যাগাজিন। মার্গারেটকে নিয়ে সচিত্র প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখক লিখল, মার্গারেট আজ ব্রিটেনে সর্বপ্রধান আলোচনার বিষয়। হাউস অফ কমন্সে কী ঘটছে না ঘটছে, আর ডলার-সঙ্কটের পরিণতিই বা কী, তার চেয়ে লোকে এখন জানতে চায় মার্গারেটের কথা।

রাজকীয় প্রোটোকল আর সংসার-জীবনের মধ্যে আত্মগোপন করেছেন এলিজাবেথ, জনসাধারণের কাছে তাই মার্গারেটই আজ সহজ দর্শনলভ্য!

থিয়েটার, নাইট ক্লাব ও সাধারণ অনুষ্ঠান—সর্বত্রই তাঁকে দেখা যায়। সারারাত ধরে নাচেও তিনি বোধ করেন না সামান্যতম ক্লান্তি। তাঁর সান্নিধ্যলাভে সকল তৃপ্ত হয়, ধন্য হয়।

১৯৪৮ সালে সরকারীভাবে হল্যাণ্ড পরিভ্রমণে গেলেন মার্গারেট। সঙ্গে যাবে কে? ডাক পড়ল টাউনসেণ্ডের। যেখানে পথ দীর্ঘ, সেখানে চাই তো বিশ্বস্ত সঙ্গী। আর টাউনসেণ্ডের মত আর কে

আছে যার কাছে নির্ভয়ে নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়? গিল্ডমোরে পিকনিক করা যায় অনেকের সঙ্গে, লণ্ডনের নাইট-ক্লাবে সাথী মেলে অসংখ্য, ব্লেনহিম প্যালেসের বল-এ মার্গারেট কয়েক শত ছেলের সঙ্গে নাচতে পারেন নিঃসঙ্কোচে। কিন্তু শত মৌমাছির মধ্যে মনভোমরাটিকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন মার্গারেট।

হল্যাণ্ড-সফরের শেষে আবার বাকিংহাম প্যালেসে ফিরে এলেন মার্গারেট। এসে শুনলেন সেই সু-খবরটি। এলিজাবেথ মা হতে চলেছেন।

বাকিংহাম প্যালেস এক নূতন আগন্তুকের আগমন-সম্ভাবনায় মুখরিত হয়ে উঠল। আবার সেই পালঙ্কে রঙ পড়ল নতুন করে, যে পালঙ্কে প্রথম শুয়েছিলেন শিশু এলিজাবেথ, রাণী মেরী নিজ হাতে তৈরি করতে শুরু করলেন দামী রেশমের উপাধান-আবরণী, তৈরি হল সাটিনের মশারী।

১৯৪৮ সালের ১৪ই নভেম্বর। বাকিংহাম প্যালেসের সামনে আবার সেদিন হাজার হাজার জনতা। অন্তহীন সমুদ্রের মত।

ঢং ঢং করে ন'টা বাজল। একজন কর্মচারী নেমে এল প্রাসাদের গেট খুলে। প্রাসাদের সামনের দেওয়ালে সেঁটে দিয়ে গেল একটি নোটিস।

নোটিসটি পড়বার জন্য হুড়োহুড়ি। কে যেন চেঁচিয়ে পড়ল, নবীন আগন্তুকের যাত্রাপথ শান্ত ও নির্বিঘ্নিত। সকলে শুনল: এলিজাবেথ এখন থেকে পুত্রসন্তানের জননী।

জনতা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। সামনে যাকে পেল টেনে নিল, তার সঙ্গে করমর্দন করল। মেয়েরা নাচতে লাগল। সিটি দিয়ে উঠল কেউ কেউ।

মার্গারেট সেদিন রাজকীয় কাজে গেছেন উত্তর ইংলণ্ডে। ঘন ঘন ট্রাঙ্ক-কল করছেন বাকিংহাম প্যালেসে। শেষের কলটি ধরলেন মার্গারেটের মা।

—রোজ, গ্রেট ব্রিটেনের ভাবী উত্তরাধিকারী যে, সে ছেলে।

রিসিভারটি রেখে দিয়েই আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন মার্গারেট। স্কারবারার আর্ল আর কাউন্টেস ছিলেন সেখানে। তাদের হাত ধরে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত নাচতে লাগলেন মার্গারেট। আর গাইলেন ব্রিটিশ জাতির প্রিয় গান, অধীর আনন্দে তারা যে গান গায়ঃ 'হি ইজ এ জলি গুড ফেলো।'

সংবাদটি শুনে শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপিটি খুলে ফেললেন এডিনবরার ডিউক—প্রিন্স ফিলিপ। বাকিংহাম প্যালেসের একটি ঘরে অধীর আগ্রহে পায়চারি করছিলেন তিনি।

প্রথম সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনায় স্বাস্থ্যপান করলেন ডিউক, তারপর গেলেন হাউস অফ উইণ্ডসরের চতুর্থ পুরুষের মুখদর্শনে। সদ্যোজাত শিশু। নিষ্পাপ অনাঘ্রাত পুষ্প। ব্রিটেনের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় ওকে নিয়ে লেখা হবে একদিন। আনন্দে ডিউকের চোখে টেম্‌সের বান ডাকল বুঝি।

আর আরও কয়েক ঘণ্টা পরে, আবার তেমনি করে বি. বি. সি. থেকে অদৃশ্য সেই পুরাতন কণ্ঠটি ইথারে ইথারে ভেসে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লঃ বি. বি. সি. থেকে খবর বলছি, আজ সকালে হার ম্যাজেস্টি নির্বিঘ্নে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। নবজাত শিশু, মানে, হিজ রয়্যাল হাইনেস প্রিন্স এখন সুস্থই আছেন, তাঁর ওজন....।

খবর পড়ছিলেন জন স্ন্যাপে। বি. বি. সি-র খ্যাতনামা অ্যানাউন্সার। আঠারো বছর আগে, তিনি এমন করে একদিন পৃথিবীকে রাজকুমারী মার্গারেটের আগমন-বার্তা শুনিয়েছিলেন।

১৯৫২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি বাকিংহাম প্যালেসে আর একটি মৃত্যুর ছায়া নেমে এল। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ পরলোকগমন করলেন। জন্ম-মৃত্যু, হাসি-অশ্রুর শত তরঙ্গভরা বাকিংহাম প্যালেস। কখনও

সে প্রভাতী সূর্যের মত উজ্জ্বল, কখনও দিনাবসানের ধূসর আকাশের মত ম্লান।

মার্গারেট তখন সবে বাইশতম জন্মদিবস উদ্‌যাপন করেছেন। বাইশটি পাপড়ি একটি বৃন্ত। কিন্তু নিকটতম আত্মীয়ের মৃত্যুশোক বড় বেশি করে বাজল মার্গারেটের। ছোটবেলা থেকে তিনি জেনেছেন আনন্দই ব্রহ্ম। আর ভোগই আনন্দ। আজ মৃত্যু এসে কেমন সব ওলট-পালট করে দিল যেন।

এই বছরই আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনলেন টাউনসেণ্ড। আর নয় এ প্রবঞ্চনা। রোজমেরি নয়, রোজ মার্গারেটই টাউনসেণ্ডের জীবনতরী। অভিজ্ঞ পাইলট টাউনসেণ্ড, তিনি জানেন কোন প্যারাস্যুটের রশি কতখানি দৃঢ়।

শ্রীমতী টাউনসেণ্ড আদালতে ডিফেণ্ড করলেন না। বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল। বোথ পার্টি এগ্রীড : শ্রীমতী টাউনসেণ্ডকে ভালবাসতেন শিল্পী জন ডি লাসজলো তিনি বিবাহিত। তবে বিচ্ছেদের মামলা আনতে দেরি হল না, অবিলম্বে শ্রীমতী টাউনসেণ্ড হলেন শ্রীমতী লাসজলো।

১৯৫২ সালের পর লণ্ডন ও আমেরিকার জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলি মার্গারেট ও টাউনসেণ্ডের সম্পর্ক নিয়ে আবার কেচ্ছা রটাতে শুরু করল। লণ্ডনের রবিবাসরীয় ‘পিপল’ লিখল—মার্গারেট একজন বিবাহ-বিচ্ছেদকারী ব্যক্তির প্রেমে পড়েছেন। তিনি তাঁকে বিয়ে করতে চান। লোকটির বয়স ৩৮ বছর।

বাকিংহাম প্যালেস থেকে এসম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশিত হল না।

এই বছর রাজমাতা মেরী ও মার্গারেটের রোডেসিয়া সফরে যাবার কথা। সঙ্গে যাবেন টাউনসেণ্ড। যাত্রার কয়েকদিন আগে টাউনসেণ্ড জানতে পারলেন তাঁকে সরকারী কাজে এলিজাবেথের সঙ্গে বেলফাস্ট যেতে হবে। টাউনসেণ্ডের বদলে মার্গারেটের সঙ্গী হবেন লর্ড প্লুনকেট নামে এক ভদ্রলোক।

বেলফাস্টে থাকতেই রাজকীয় অনুজ্ঞা এল টাউনসেণ্ডের কাছে.

তাঁকে ব্রুসেল্‌সে এয়ার অ্যাটাচি করা হয়েছে। এখন থেকে তাঁকে বেলজিয়ামে থাকতে হবে।

টাউনসেণ্ড বুঝলেন, তাঁকে ব্রিটেন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা।

রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে একই প্লেনে লণ্ডন পর্যন্ত এলেন টাউনসেণ্ড। রাণী মৃদু হেসে টাউনসেণ্ডের শুভেচ্ছা কামনা করলেন। ডিউক করমর্দন করে বললেন—গুড বাই, উইশ ইউ গুড লাক।

ওঁরা নেমে গেলেন। তারপর ক' মিনিটের মধ্যেই সেই প্লেন টাউনসেণ্ডকে নিয়ে চলল নির্বাসনে—ব্রুসেল্‌সে।

কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকার খবরের কাগজগুলি শুধু লিখল, যেহেতু টাউনসেণ্ড বিবাহ-বিচ্ছেদকারী ব্যক্তি, এবং যেহেতু চার্চ অফ ইংলণ্ড এই বিবাহে সম্মতি দেবেন না, সেই হেতু মার্গারেট টাউনসেণ্ডকে বিবাহ করতে সাহস পেলেন না।

বাকিংহাম প্যালেস থেকে এবারও কোন প্রতিবাদ এল না।

ব্রুসেল্‌সে নামতেই রিপোর্টাররা ছেঁকে ধরল টাউনসেণ্ডকে। টাউনসেণ্ড পালিয়ে বাঁচলেন। নিজেকে গুটিয়ে ফেললেন বাইরের পৃথিবী থেকে। শুধু কাজ, কাজ, আর কাজ।

ব্রুসেল্‌সে ব্রিটিশ দূতাবাসের এয়ার অ্যাটাচি টাউনসেণ্ড রোজ সকালে ঘোড়ায় চড়ে কিছুদূর বেড়িয়ে আসেন। তারপর সারাদিন কাজ করেন। কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। বাইরে কদাচিৎ লাঞ্চ বা ডিনার খান।

টাউনসেণ্ডকেও ভুলতে চান মার্গারেট। মার্গারেট আজ ব্রিটেনের হিরোইন। তাঁর কটাক্ষঘাতে ব্রিটেনের যৌবন চঞ্চল হয়। টেম্‌সের জলে বান ডাকে। রাজ-পরিবারের যে-কোন ছেলে তাঁকে পেলে ধন্য মনে করে। তবে কেন তিনি ভাবেন এক প্রায়-বিগতযৌবন বিপত্নীক যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর কথা।

কিন্তু উদ্বিগ্ন চিন্তার নদী পৌঁছয় না সিদ্ধান্তের সমুদ্রে। সে শুধু আবর্ত তোলে দ্বিধার, ঝড় আনে শঙ্কার।

ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপের কাছে মার্গারেট জানান করুণ আকুতি—বলুন প্রভু, কোথায় শান্তি ?

আমেন। বাইবেল থেকে সুসমাচার পাঠ করে শোনান আর্চবিশপ। যীশু বলিলেন—তাহারা যেন জীবন পায়, উপচয় পায়।

জীবনের উপচয়কে খ্রীষ্ট-ভজনার মধ্যে পেতে চাইলেন মার্গারেট। এখন আর বল-রুমে নিত্য নতুন পার্টনারের সঙ্গে তোলেন না দেহ-বল্লরীর ছন্দ। নাইট-ক্লাবে নৈশ মদিরার পাত্রগুলি বুঝি শূন্য যায় এতদিন পর। নিয়মিত চার্চে আসেন। অর্গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হিম গান। প্রার্থনার পর হাঁটু গেড়ে বসে থাকেন চ্যাপেলে অনেক নীরব মুহূর্ত। হে প্রভু, তুমি পৃথিবীকে আলো দিয়েছ, আলো আনো আমার জীবনে। আলো, জীবন আর উপচয়।

সবাই বললে, মার্গারেট এবার নান্ হয়ে যাবেন।

কিন্তু না, তাহলে তো ইংলণ্ডের ইতিহাসকার এখানেই থেমে যেতেন। পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা ভরা নীরস ইতিহাস। তার মাঝে মার্গারেটই সে নীরস মরুভূমিকে সরস করেছেন, উর্বর করেছেন। মার্গারেট যদি নান্ হতেন, তাহলে টয়নবির জয় হত, স্কটের নয়।

১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে এলিজাবেথ ও এডিনবার ডিউক ছ' মাসের জন্য নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরে গেলেন। রাজ-পরিবারের পাঁচজনকে নিয়ে অস্থায়ী কাউন্সিল গঠন করে, তাদের ওপর ব্রিটেনের অন্তবর্তীকালীন শাসনভার ন্যস্ত হল। মার্গারেট ছিলেন সেই কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য।

অতি শীঘ্রই মার্গারেট বিষণ্ণতাকে কাটিয়ে উঠলেন। আবার তাঁকে পূর্বপরিচিত স্থানগুলিতে দেখা যেতে লাগল। ১৯৫৫ সালে তাঁকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক সরকারী শুভেচ্ছামূলক সফরে পাঠান হল।

আর ঐ বছরই ২১শে অগস্ট মার্গারেট ২৫ বছরে পড়লেন।

ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের নিয়ম-অনুযায়ী, ২৫ বছর অতিক্রম

করার পর রাজকুমারীরা অভিভাবকের সম্মতি-ব্যতিরেকে বিবাহ করতে পারেন।

পঁচিশতম জন্মদিবস উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষেই মার্গারেট ছুটলেন ট্রাঙ্ক-কল করতে। ট্রাঙ্ক-কল করলেন পিটার টাউনসেণ্ডকে। অনেকে বলেন, টাউনসেণ্ডের সঙ্গে মার্গারেট তখনও সব সম্পর্ক ত্যাগ করেন নি। টেলিফোনে কি কথা হল, তা অজানা—তবে তার ক'দিন পরেই ১৪ই অক্টোবর তারিখে টাউনসেণ্ড এসে পৌঁছলেন লণ্ডনে। এয়ারপোর্ট থেকে টাউনসেণ্ড সোজা চলে গেলেন, আবারগাভেনির মারকুইসের প্রাসাদে। সেখানে বাসকসজ্জিকা মার্গারেট প্রতীক্ষারতা।

ত্ব'বছরের বিচ্ছেদের পর আবার মিলন। জেবউন্নিসা দেখলেন মবারককে।

মবারক জেবউন্নিসাকে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে একখানি গাড়ি ফিরে গেল। সে গাড়িতে চালক ছাড়া একজন আরোহী। তিনি পিটার টাউনসেণ্ড।

মার্গারেটের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল, সাধারণের কাছে তা অজ্ঞাত। তবে টাউনসেণ্ড প্রাসাদ থেকে বার হয়ে আসতেই অপেক্ষমান এক রিপোর্টার তাঁকে বললেন: আপনি জানেন না, আপনার জন্য আমাদের সকলের কি নিদারুণ মানসিক অবস্থা।

—আপনিও জানেন না, আমার মানসিক অবস্থাও কি নিদারুণ—ম্লান হেসে জবাব দিলেন টাউনসেণ্ড।

ঐ রিপোর্টারটি পরদিন সংবাদ পাঠালেন: টাউনসেণ্ডের সহিত মার্গারেটের বিবাহের যে সম্ভাবনা একদা অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহা আবার নূতন করিয়া দেখা যাইতেছে। তুই-একদিনের মধ্যেই তাঁহারা এনগেজমেণ্ট ঘোষণা করিবেন আশা করা যায়।

পরদিন আর একটি রাজকীয় বিবৃতি প্রকাশিত হল—রাজকুমারী মার্গারেটের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে এখনও কিছু চিন্তা করা হয়নি।

ঐ সপ্তাহের শনিবারটি মার্গারেট ও টাউনসেণ্ড একসঙ্গে কাটালেন, মার্গারেটের এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

হয়তো দীর্ঘ দু'বছর ধর চিন্তার পর মার্গারেট একটি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। সে-সিদ্ধান্ত রাজকীয় সম্মান ও প্রতিপত্তির চেয়ে প্রেম বড়। হয়তো তিনি সে মুহূর্তে বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিলেন টাউনসেণ্ডকে। কিন্তু রাজ-পরিবারের সকলেই বাদ সাধল। এলিজাবেথ, ডিউক, রাজমাতা, ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ, লর্ড-সভার সদস্যরা—সকলের মুখে এক বাক্য ঃ এ বিয়ে হতে পারে না।

জীবনের এক চরম বিষাদময় মুহূর্তে মার্গারেট একদা আশ্রয় নিয়েছিলেন চ্যাপেলের কোণে। দুঃখের দহনজ্বালা থেকে মুক্তি। সান্ধ্য প্রার্থনা-সঙ্গীতের মাঝে সকল বঞ্চনামুক্ত জীবনের আশ্বাস। আজও মার্গারেট আবার চলে গেলেন সে নিভৃতলোকে।

যাকে ভালবেসেছেন, সমাজ তাকে নিয়ে সুখী হতে দেবে না। নিষ্ঠুর অনুশাসন! মার্গারেট ভাবলেন, এর চেয়ে যদি তিনি সামান্য কৃষকের ঘরে জন্মাতেন! স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডের কোন মেষপালকের ঘরে। পাহাড়ের উপত্যকায় হ্রদের ধারে একটা ছোট্ট কুটির। মনের মানুষকে নিয়ে মেষ চরাতে বার হতেন। হ্রদের জলে পা ডুবিয়ে হাত-ধরাধরি করে বসে থাকতেন। ধিক রাজত্ব! ধিক রাজকুমারীর জীবন!

ক্যান্টারবোরির আর্চবিশপ আবার এলেন। বুকে ক্রশ-চিহ্ন এঁকে বললেন 'আমেন!' তারপর একখানি বই টেনে এনে রাজকুমারীর কাছে এগিয়ে দিলেন বিশপ।

ঃ বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলি আমি দাগ দিয়েছি। সস্নেহে বললেন বিশপ।—ঐ বইটি পড়ুন রাজকুমারী। দুঃখজয়ের মন্ত্র পরম পিতা দিয়ে গেছেন আমাদের।

ধীরে ধীরে পবিত্র বাইবেলটি নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন মার্গারেট।

ফিরে এলেন কয়েক মুহূর্ত পরেই। বাইবেলটি ফেরত দিয়ে

বললেন : আর্চবিশপ, এই বই তুলে রাখতে পারেন আপনি। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

মুক্তার বিন্দুর মত কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ল বাইবেলের মলাটে। এরই নাম প্রেম—সে মৃত্যুহীন, সে অনির্বাণ, সে বিচার করে না কে সম্রাজ্ঞী, কে ভিখারিণী। মানুষের জীবনে তার উদয় কালবৈশাখীর মত, সে যখন আসে তখন সাড়া জাগায় না, নাড়া জাগায়। রুদ্ধ কবাট সে ভেঙে ফেলে দস্যুর মত। তারপর একদিন চলে যায়, পিছনে রেখে যায় আহত পৃথিবী, আহত হৃদয়। কখনও সে প্রলয়ের পর আকাশে আবার চাঁদ ওঠে, ফুল ফোটে। কিন্তু অন্ধ অমাবস্যার কালবৈশাখী—সে শুধু সৃষ্টিকে ভাঙতে আসে, গড়তে নয়।

ক'দিন পরে সাসেক্সে রবিবারে এক সন্ধ্যা। প্রথম হেমন্তের অম্লান সূর্যের শেষ আলো পাইন গাছের পাতায় পাতায়। রাতের মন্দিরে বেলাশেষের বিদায়-অর্ঘ্য।

হাত-ধরাধরি করে অনেকক্ষণ ওঁরা বেড়ালেন। রেনাউল্ট উদ্যানের সবুজ ঘাসের উপর অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসলেন দুই অনাদিকালের প্রেমিক, মার্গারেট আর টাউনসেণ্ড।

এইবার বাকিংহাম প্যালেস থেকে বিবৃতি প্রকাশিত হল। রাজকুমারী মার্গারেট জানিয়েছেন,তিনি টাউনসেণ্ডকে বিবাহ করছেন না।

: রাজ-পরিবারের অনুজ্ঞাকে অমান্য করে সিভিল ম্যারেজ হয়তো করতে পারতাম, কিন্তু আজন্ম প্রাপ্ত খ্রীষ্টের শিক্ষা ও তদুপরি কমনওয়েল্‌থের প্রতি কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি রেখে আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। তবে গ্রুপ ক্যাপটেন টাউনসেণ্ডের কাছ থেকেও আমি এই ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। তিনি আমাকে দৃঢ় হবার মত সাহস দিয়েছেন।

এই বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে দ্বাদশ বর্ষ-ব্যাপী এক প্রেম-উপাখ্যানের উপর যবনিকা পড়ল।

আর টাউনসেণ্ড আবার ফিরে গেলেন ব্রুসেল্‌সে। দীর্ঘ বারো

বছর ধরে মেঘ ও রৌদ্রের দোলায় দুলেছেন তিনি। এইবার সেই ক্ষণিকের রৌদ্রটুকুরও অবসান।

সেই নিঃসঙ্গ জীবন আরও নিঃসঙ্গ হল।

ধীরে ধীরে নিজেকে বাইরের জগৎ থেকে গুটিয়ে নিলেন টাউনসেণ্ড। তাঁর নাম হারিয়ে গেল সময়ের বিরাট পাথরটার আড়ালে।

এরপরে কয়েকটি খবর নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়েছিল। মার্গারেট নাকি শীঘ্রই বিবাহ করতে চলেছেন। সম্ভাব্য পাত্র ছিল অনেকেই, মার্গারেটের নূতন অন্তরঙ্গ বন্ধু খ্রীষ্টোফার লয়েড, জিরাল্ড ব্রিজম্যান, সুইডেনের রাজকুমার বারথিল।

কিন্তু পৃথিবীর নরনারীর জন্য আরও একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আরও কয়েক বছর পরে।

১৯৬০ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ছিল সে তারিখটি। সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের সময় ক্লারেন্স হাউস থেকে রাণী এলিজাবেথ ও রাজমাতার স্বাক্ষর-সংবলিত একটি বিবৃতি প্রচারিত হল। রাজকুমারী মার্গারেটের সঙ্গে আর্মস্ট্রং জোন্‌স্ নামক এক ব্যক্তির বিবাহে সম্মতি তাঁরা দিয়েছেন।

খবরটি রকেটের মত ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে প্রশ্ন তুললঃ কে এই আর্মস্ট্রং জোন্‌স্? কে এই ভাগ্যবান?

তিনি যেই হোন, রাজকুমারী মার্গারেট তাঁকে ভালবেসেছেন। শত মক্ষিকার মাঝখান থেকে আপন মনভোমরাটির সন্ধান পেয়েছেন মার্গারেট। একটুকুই যথেষ্ট। তিনি তাঁর ফিঁয়াসেকে নিয়ে উইণ্ডসর ক্যাসেলে গেছেন, সেখানেই এই শনি-রবিবারটি কাটাবেন তাঁরা। কিন্তু তবু সাধারণে প্রশ্ন করে চলে।

: তা তো বুঝলাম। কিন্তু লোকটি কে?

: তা তো আমিই জানি না বাপু, নামটি যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। ঐ নামে একজন ফটোগ্রাফারকে চিনি। ঢ্যাঙা মতন।

রয়্যাল ফ্যামিলির ফটো তুলত। তা, ভালই ফটো তুলত ছেলেটা। দাঁড়াও, খোঁজ করি সে-ই কি-না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, হ্যাঁ, তিনিই বটেন। মার্গারেটের চেয়ে বয়সে পাঁচ মাসের বড়। বাবার তিন বিয়ে। তাঁর যখন ছ'বছর বয়স, বাবা প্রেমে পড়লেন একজন অস্ট্রেলিয়ান অভিনেত্রীর। অতএব তাঁর মাকে তালাক দিলেন, তার বদলে গৃহলক্ষ্মী হল সেই অভিনেত্রী।

কিন্তু অভিনেত্রীর বুঝি স্টেজের বাইরে মন টিঁকল না। আর রোনাল্ড আর্মস্ট্রং-এর বয়স হলেও অতি সত্বর আবার প্রেমে পড়তে কোন অসুবিধে হল না। এবারের পাত্রীটি জনৈকা প্রাক্তন এয়ার-হোস্টেস। বয়স তাঁর ছেলের চেয়ে এক বছরের বেশী।

তরুণী ভার্যাকে নিয়ে জীবনের তৃতীয় মধুচন্দ্রিমা যাপন করছিলেন রোনাল্ড। শুনলেন তাঁর যোগ্যপুত্র টনি আর্মস্ট্রং জোনস্ আজ পৃথিবীর হিরো। নব-পরিণীতা বধূকে আরও কাছে টেনে রোনাল্ড বললেন : শাবাশ বেটা!

টনি আর্মস্ট্রং নেহাৎ হেলাফেলার লোক নন। ইটন আর কেমব্রীজের ছাত্র। ভাল স্পোর্টস্ম্যান। ১৯৫০ সালের কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌকা-বাইচ প্রতিযোগীতায় তাঁর তরণীটাই আগে তীরে ভিড়েছিল। তাঁর টিউটরের মতে টনি পড়াশুনোয় খুব ভাল নন। স্থাপত্যবিদ্যায় দু'বার পরীক্ষা দিয়ে দুবারই ফেল করেছেন। তবে তিনি নাকি খুব স্বাবলম্বী।

স্থাপত্যবিদ্যার চেয়ে ফটোগ্রাফির দিকেই টনির বেশী প্রবণতা। বিখ্যাত সোসাইটি-ফটোগ্রাফার ব্যারনের সাগরেদি করে এসেছেন কয়েকদিন। গুরুদেবের মৃত্যুর পর লণ্ডনের এক জনাকীর্ণ অঞ্চলে একটি ছোট্ট স্টুডিও খুলে বসেছেন, একটি ছোট ফ্ল্যাটে একাকী থাকেন, স্বপাক আহার করেন। প্রায়ই বেরিয়ে পড়েন ক্যামেরা নিয়ে, দুর্লভ দৃশ্য বন্দী করেন। এক্সপোজার আর আলো-ছায়ার খেলা দেখিয়ে অনেক দৃশ্যকে করেন দুর্লভ।

একটা অ্যালবাম বাজারে বার করেছেন, নাম 'লণ্ডন'। কতগুলি স্ব ও সু'নির্বাচিত ছবি। সবাই বলেছে, ছেলেটির ফিউচার আছে।

একদিন একটা দুঃসাহসিক কাজ করে বসেন টনি আর্মস্ট্রং জোন্স্। কেন্টের ডিউককে চিঠি লেখেনঃ আপনার ছবি তুলতে চাই। সম্মতি আসে। ছবি তোলেন এবং সে ছবিই আর্মস্ট্রং জোন্সের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অগ্রদূত হয়ে আসে।

১৯৫৬ সালে রাজকুমার চার্লসের অষ্টম জন্মদিনে তাঁর ছবি তোলার জন্য ডাক পড়ে আর্মস্ট্রং-এর। এ ছবিটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় এক্সপেরিমেন্ট। সারি সারি আয়না রেখে ছবিতে তিনজন চার্লস্‌কে পাশাপাশি দেখানো হয়। আর একটি বিরাট গ্লোবের দুধারে বসে থাকেন চার্লস্ ও অ্যান। আরও দু'বছর পরে মার্গারেটের সঙ্গে তাঁর একটি পার্টিতে আলাপ হয়।

১৯৫৮ সালে মার্গারেটের জন্মদিনের ছবি তোলবার জন্যও ডাক পড়ল আর্মস্ট্রং-এর।

আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করতেন মার্গারেট। তাঁর ডাক পড়ত প্রায়ই। সকলে ভাবত কি অসীম করুণা রাজকুমারীর। সামান্য একজন ফটোগ্রাফারের প্রতিও তাঁর কৃপার অন্ত নেই। আর্মস্ট্রং-মার্গারেটের প্রণয় উপাখ্যানের যে চমকপ্রদ বিবরণ পরে পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে, এই সময় থেকেই নাকি তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই প্রেমের কুঁড়িটিকে দুজনে দুজনার হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন সংগোপনে। কখনও তাদের লোকসমক্ষে ফুল হয়ে ফুটতে দেন নি।

মার্গারেট লোকসমক্ষে আর্মস্ট্রং-এর প্রতি এমন ভাব দেখাতেন যে, একজন ফটোগ্রাফার হিসাবেই তাঁকে খাতির করেন। হয়তো বন্ধু-পরিবেষ্টিতা মার্গারেটের সামনে প্রবেশ ঘটল আর্মস্ট্রং-এর। মার্গারেট সোল্লাসে আহ্বান জানালেনঃ এই যে, এস ফটোগ্রাফার।

একদিন আর্মস্ট্রং-এর স্টুডিও দেখতে গিয়েছিলেন মার্গারেট।

কিন্তু এত গোপনে যে, ঐ স্টুডিওর পরিচারিকা পর্যন্ত জানতে পারেনি।

এই লুকোচুরির পালা অবসান করে একদিন তাঁদের বিবাহের কথা ঘোষিত হল। শেষ হল বিশ শতকের সেরা প্রেম-উপাখ্যান।

যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল সে দিনগুলির মাঝে এল বুঝি মধুমাসের লগ্ন। অতলান্তিকের অন্তহীন নীলাম্বুরাশির মধ্যে যে তরণী এতদিন ছিল দিগ্‌ভ্রান্ত, তার অমল ধবল পালে আবার লাগল বুঝি মন্দ মধুর হাওয়া।

বাকিংহাম প্যালেসের প্রমোদ-উদ্যানে উইলো গাছের শাখে শাখে বসন্তের কোকিলরা আবার ডাকল। ইংলণ্ডে বসন্ত এল। ১৯৬০ সালের বসন্ত।

সে বসন্ত শুধুই ফোটা ফুলের মেলা। সমগ্র ব্রিটিশ জাতির জীবনে এবারের বসন্ত সার্থক হয়ে উঠল। এই মধুমাস তাদের রাজ-কুমারীর জীবনকে ফলে-ফুলে সার্থক করবে।

গোলাপফুলেরই এক নাম মার্গারেট, রোজ মার্গারেট। তাই গোলাপফুলের স্তবকে স্তবকে ভরে গেল রাজপথ। বাকিংহাম প্যালেস থেকে ওয়েস্টমিনিস্টারে যাবার প্রশস্ত পথ ম্যাল। ত্রিশ হাজার রক্ত-গোলাপ দিয়ে সে পথকে করা হল সুশোভিত। ৬ই মে তারিখে বিবাহের শোভাযাত্রা যে পথ দিয়ে যাবে, সে পথ হোক কুসুমাস্তীর্ণ। জীবনে পরম বেদনা পেয়েছেন রাজকুমারী। বেদনাঘন জীবনের অবসানে পুষ্পিত এই যাত্রাপথ স্মরণীয় হয়ে থাকুক তাঁর জীবনে।

তবু লেবার পার্টির কয়েকজন সদস্য পার্লামেণ্টে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন। 'স্পীকার স্যর, রাজকুমারীর বিবাহে শুধু রাস্তা সাজাবারই খরচ হয়েছে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। হার ম্যাজেস্টিস গভর্নমেণ্টের তহবিল থেকে এই পরিমাণ অর্থব্যয়, আমরা অপব্যয় বলেই মনে করি।'

ইতিমধ্যে ক্লারেন্স হাউস ভরে উঠেছে বিবাহের উপহারে। জলস্রোতের মত উপহার আসছে। ব্রিটেনের দূরতম প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পাঠাচ্ছে উপহার। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান ও তাঁর মন্ত্রিসভার ১৮ জন সদস্য মিলে দিয়েছেন প্রাচীন বহুমূল্য টেবিল, শ্রীঅলিভার মেসেল দিয়েছেন সতেরো শতকের দুর্লভতম ফ্লেমিশ স্ক্রীন, বিমান-বাহিনী দিয়েছে সুদৃশ্য ডিনার-প্লেটের সেট, আর এসেছে চেক্। ব্রিটেন থেকে, পাকিস্তান থেকে, সুদূর ফিজি দ্বীপ থেকে। তাদের মিলিত পরিমাণ প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এসেছে রকমারি কাপড়। অসংখ্য বস্ত্রের বিপুল সমারোহের মধ্যে একখানি ব্রোকেড ছিল বিশেষভাবে চিহ্নিত। সেটি পাঠিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু। বারাণসীর কারিগরদের তৈরি এই বিশেষ উপহারটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন নেহরু। আর এসেছিল বহু অসংখ্য হীরা মণি-মাণিক্য খচিত অলংকার।

ভোর না হতেই ব্যাগপাইপের মিষ্টি আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল মার্গারেটের। জানালা খুলে প্রাসাদের বাইরে তাকিয়ে মার্গারেট দেখলেন পূর্ব দিগন্তের সূর্য-সম্ভাবনা। ৬ই মে-র সূর্য উঠতে আর বেশী দেরি নেই।

প্রতিদিনের মত বেড-টি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী রুবি গর্ডন। মার্গারেটের পরিচারিকা। প্রভাতী চা-পর্ব হল সমাপন। তারপরে এল হেয়ার-ড্রেসার। কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘবরণ চুলে ছন্দ-রচনার কাজ শুরু হয়েছিল গতদিন থেকে। আজ শুধু ফিনিশিং টাচ। মেঘবরণ চুলের সঙ্গে পরচুলা এসে মিলল। অতলান্তিকের ঢেউ উঠল কেশদামে। সিঁথিতে পরলেন সত্তর হাজার টাকা মূল্যের হীরক-খচিত টায়রা। ত্রিশ বছরের উদ্ধত যৌবন বন্দী হল শুভ্র সিল্কের ব্রেসিয়ারে। তার ওপরে পরলেন মরাল-শুভ্র সিল্কের স্কার্ট। সে পোশাকে কারু-কার্যের প্রাচুর্য ছিল না, ছিল সহজ সৌন্দর্যের দ্যোতনা। মাথায়

সূক্ষ্ম চিকন ওড়না। হাতে নিলেন অর্কিড আর লিলির গুচ্ছ। তাঁর অলক্তরঞ্জিত অধরে লাজ-নম্র হাস্য। শুভ্র পদযুগল ঈষৎ দ্বিধায় জড়িত। প্রসাধিত আঁখি-পল্লব শুভদৃষ্টির পরম লগ্নটির জন্য তৃষ্ণামগন।

রাণী এলিজাবেথ ও রাজমাতা আগেই যাত্রা করেছিলেন অ্যাবেতে। সকাল এগারোটার সময় এলেন প্রিন্স ফিলিপ। তার আগেই আট জন ব্রাইড্‌স্‌মেড যাত্রা করেছে অ্যাবের উদ্দেশ্যে।

ম্যালের মধ্য দিয়ে পথ। সেখানে পথের দুধারে লক্ষ লোকের জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। গতকাল থেকে সারারাত ধরে তারা অপেক্ষা করে আছে। প্যালেসের সামনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-সৌধটি পূর্ণ হয়ে গেছে সারা বিশ্ব থেকে আসা রিপোর্টারে। শত শত ক্যামেরাগুলি যেন ক্ষুদে মেশিনগান।

খোলা গাড়ি করে বার হলেন ফিলিপ আর মার্গারেট। জনতা অধীর আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

তারপর ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে সমগ্র ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠব্যক্তি ও কমনওয়েল্‌থের প্রধানমন্ত্রীর সম্মুখে বেস্টম্যান ডাঃ ফিশার নব-দম্পতীর অঙ্গুরীয়-বিনিময় করালেন। অর্গান বেজে উঠল। অর্গানের সুরে সুরে সম্মিলিত কণ্ঠে শুরু হল অ্যানথেম। হাত-ধরাধরি করে কার্পেট-বিছানো অ্যাবের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন নব-দম্পতী। এবার বাইরে সমুদ্রের গর্জন প্রবলতর হল। সে গর্জন জনসমুদ্রের। টেলিভিসনের সামনে বসা ব্রিটেনের কয়েক কোটি মানুষ দেখল, উল্লসিত জনতা গাইছে—হি ইজ এ জলি গুড ফেলো! দেখল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুলিস-বাহিনী মেট্রোপলিটান পুলিস বুঝি জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ করতে এই প্রথমবার ব্যর্থ হল।

আর কয়েক ঘণ্টা পরেই টেম্‌সের জলে ভাসল 'ব্রিটানিয়া'। সে তরণী নদী পেরিয়ে সমুদ্রে পড়বে। তার লক্ষ নারিকেলকুঞ্জ-শোভিত এক মনোমুগ্ধকর দ্বীপ। লবণাক্ত সমুদ্রের মাঝে একমুঠো শান্তি। কে যেন বলেছিল, মানুষের জীবনটাও এমনি যেন। শান্তির দ্বীপটি

বেদনার লবণাক্ত সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। দুঃখনিশার শেষে সে দ্বীপে উত্তরণ যার সম্ভব, সে-ই জীবন-সমুদ্রের যথার্থ নাবিক।

আর যারা হতভাগ্য, তারা সে দ্বীপের সন্ধান পায় না, তারা নিজেরে হারায়ে বার বার খোঁজে, কিন্তু আনন্দের বদলে পায় বেদনা, আলোকের বদলে দাহ। তাদের পাল ভাঙে ঝড়ে, নোঙর ছেঁড়ে তুফানে।

৬ই মে-র উৎসব সমারোহের মাঝে এমনি এক হতভাগ্যের কথা কেউ মনে রাখে নি।

* * *

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওপর বসে আমাকে এই জীবন-কথা শুনিয়েছিলেন মিঃ বাক্সটার—ফ্লিট স্ট্রীটের একজন নাম-করা সাংবাদিক। শুধু তাই নয়, তিনি আবার বাকিংহাম প্যালেস-স্পেশালিস্ট।

বাকিংহাম প্যালেসের দিকে মুখ করে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। তখন জনতা ছত্রাকার হয়ে গেছে। কাল সারারাত ধরে লোকগুলো পথের দু'ধারে বসেছিল। আজ এখন তারা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

মিঃ বাক্সটার বললেন: বাকিংহাম প্যালেসের সামনে এত ভিড় অভূতপূর্ব। কত রাজকুমারীরই তো বিয়ে হল এই প্রাসাদ থেকে কিন্তু মার্গারেট কামাল করে দিল সকলকে।

বাকিংহাম প্যালেসের ছাদের ওপর তাকালাম। প্যালেসের ওপর পত পত করে উড়ছে পতাকা। পতাকাটি মাঝে মাঝে হাওয়ায় জড়িয়ে যাচ্ছে পতাকা-দণ্ডের সঙ্গে। একটি লোক অনবরত চেষ্টা করছে সেটি ছাড়িয়ে দেবার।

মিঃ বাক্সটার বললেন: কী দেখছেন? ওই লোকটির নাম হল কর্পোরাল বেকন। প্যালেসের রয়াল ফ্ল্যাগ-মাস্টার। ওর চাকরি হল, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পতাকাটি যাতে ঠিক ভাবে ওড়ে তার ব্যবস্থা করা। আজ লণ্ডন শহরে সব লোকের ছুটি, কিন্তু মিঃ বেকনের ছুটি নেই। লোকে বলে বাকিংহাম প্যালেসে সব থেকে যদি কঠিন কাজ থাকে তাহলে তা নাকি এটাই।